দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

রাজনীতির গুমঘর থেকে ইতিহাসের মুক্তি — পৃঃ ২৩

বৃহন্নলা মিডিয়ার কটাক্ষ এড়িয়ে পুষ্কর পণ্ডিতের বাজিমাত — পৃঃ ২৬

৭৪ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ২৮ মার্চ, ২০২২।। ১৩ চৈত্র - ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

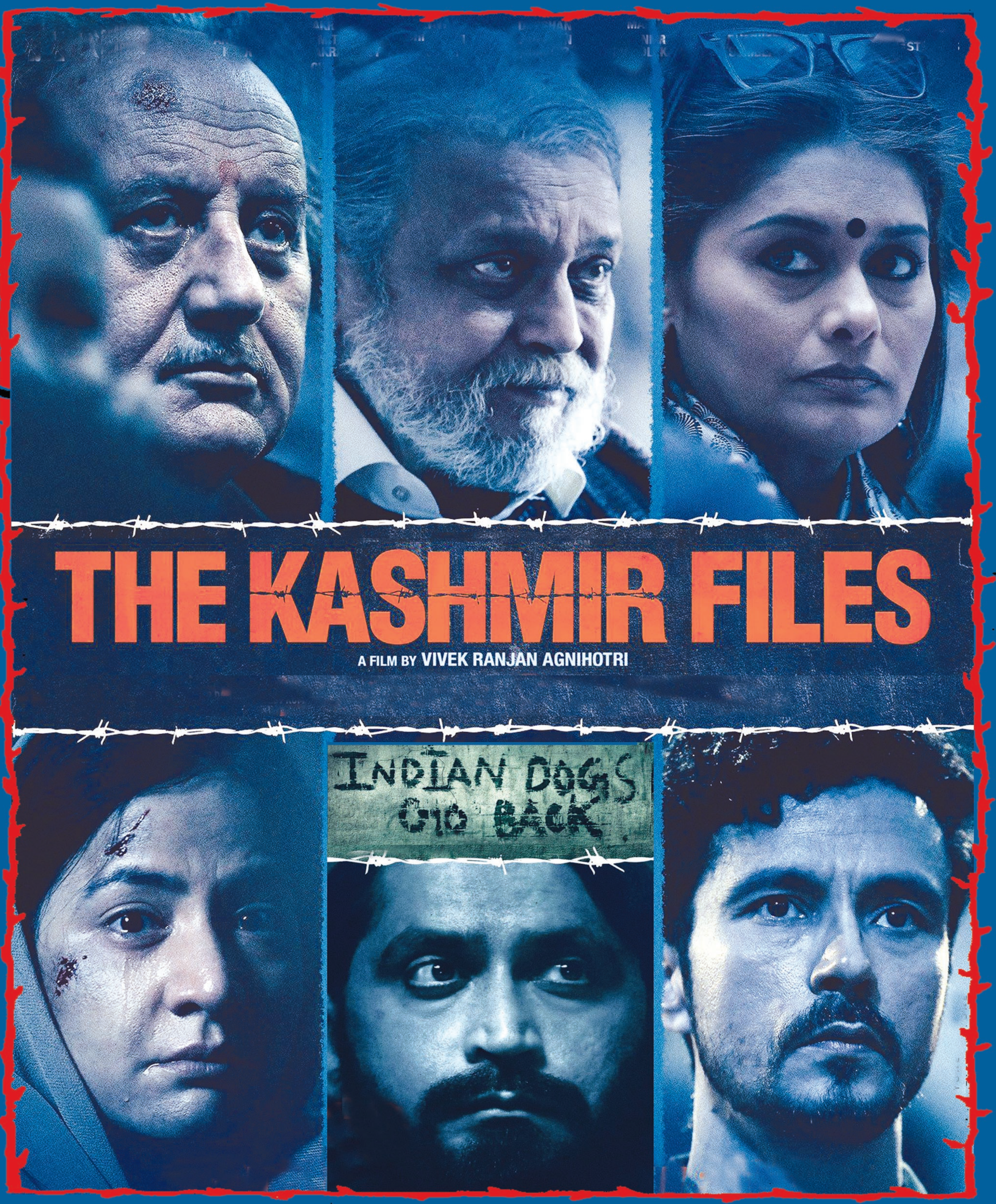

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ১৩ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৮ মার্চ - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

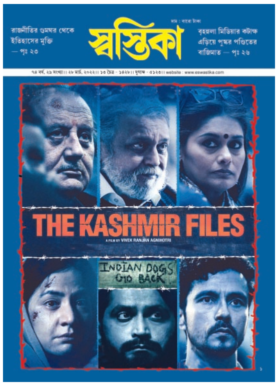

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

'দলবদলুদের' আসানসোলে অগ্নিপরীক্ষা, বালিগঞ্জে নিয়মরক্ষা ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মা-মাটি-রক্ত ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

স্পিলবার্গ দেখালে শিল্প, বিবেক দেখালে প্রোপাগান্ডা ◻ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৮

প্রতিটি বাঙ্গালি হিন্দুর দ্য কাশ্মীর ফাইলস দেখা উচিত ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

মোদী উত্তরপ্রদেশে ভোটের ব্যাকরণ বদলে দিয়েছেন ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১১

সৃষ্টির জগৎকে রাজনীতিমুক্ত না করলে বইমেলা বাঁচবে না ◻ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ◻ ১৩

নির্মলার নির্মল বাজেট ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ১৫

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব, স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রতার দিকে : দত্তাত্রেয় হোসবলে ◻ ১৭

রাজনীতির গুমঘর থেকে ইতিহাসের মুক্তি ◻ হীরক কর ◻ ২৩

বৃহন্নলা মিডিয়ার কটাক্ষ এড়িয়ে পুষ্কর পণ্ডিতের বাজিমাত ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৬

প্রাণনাশের হুমকিতে বিচলিত নন বিবেক অগ্নিহোত্রী ◻ অনামিকা দে ◻ ২৯

বর্ষপ্রতিপদ পৃথিবীর আদি নববর্ষ ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ৩১

বুদ্ধপূর্ণিমায় অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার-উৎসব ◻ দেবাশিস চৌধুরী ◻ ৩৩

বামপন্থীরাই বাঙ্গালির সর্বনাশের মূলে ◻ পুলকনারায়ণ ধর ◻ ৩৫

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে তৃণমূলের অশ্বডিম্ব প্রসব ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৩৮

কাশ্মীর ফাইলসের দর্শন দিয়ে কাশ্মীরকে ফিরে দেখা : ৩৫এ ধারা এবং এর রাজনৈতিক ফলশ্রুতি ◻ বিমল শঙ্কর নন্দ ◻ ৪৩

বাংলাদেশে হিন্দুদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ায় ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন ◻ ধীরেন দেবনাথ ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ রঙ্গম : ৪৭ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

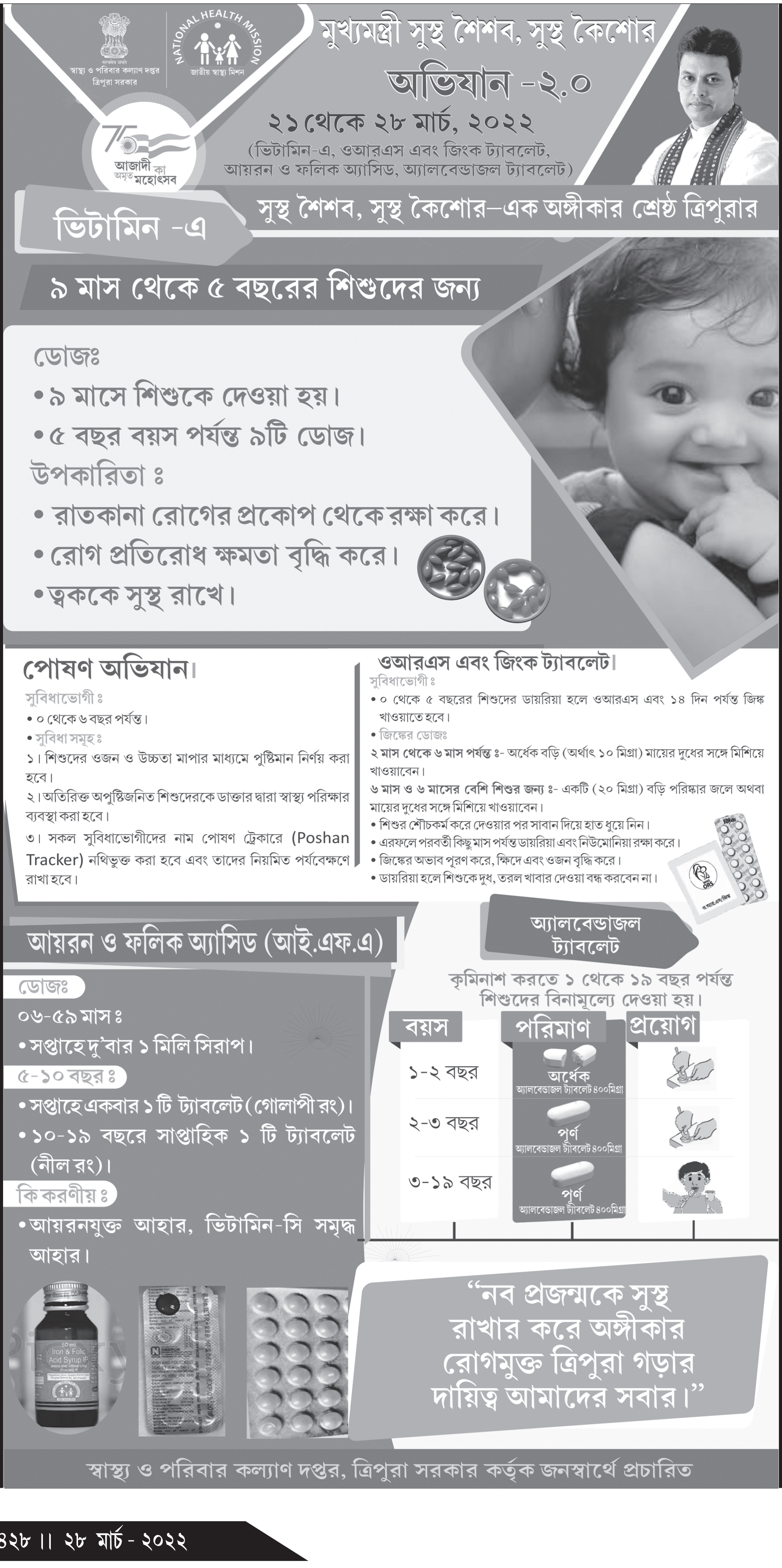

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
NATIONAL HEALTH MISSION
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন
আজাদী কা অমৃত মহোৎসব
মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর
অভিযান -২.০
২১ থেকে ২৮ মার্চ, ২০২২
(ভিটামিন-এ, ওআরএস এবং জিংক ট্যাবলেট, আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড, অ্যালবেন্ডাজল ট্যাবলেট)
ভিটামিন -এ
সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর–এক অঙ্গীকার শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার
৯ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের জন্য
ডোজঃ
•৯ মাসে শিশুকে দেওয়া হয়।
•৫ বছর বয়স পর্যন্ত ৯টি ডোজ।
উপকারিতা ঃ
• রাতকানা রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে।
• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
•ত্বককে সুস্থ রাখে।
পোষণ অভিযান।
সুবিধাভোগী ঃ
• ০ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত।
• সুবিধা সমূহ ঃ
১। শিশুদের ওজন ও উচ্চতা মাপার মাধ্যমে পুষ্টিমান নির্ণয় করা হবে।
২। অতিরিক্ত অপুষ্টিজনিত শিশুদেরকে ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।
৩। সকল সুবিধাভোগীদের নাম পোষণ ট্রেকারে (Poshan Tracker) নথিভুক্ত করা হবে এবং তাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।
ওআরএস এবং জিংক ট্যাবলেট।
সুবিধাভোগী ঃ
• ০ থেকে ৫ বছরের শিশুদের ডায়রিয়া হলে ওআরএস এবং ১৪ দিন পর্যন্ত জিঙ্ক খাওয়াতে হবে।
• জিঙ্কের ডোজঃ
২ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত ঃ- অর্ধেক বড়ি (অর্থাৎ ১০ মিগ্রা) মায়ের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবেন।
৬ মাস ও ৬ মাসের বেশি শিশুর জন্য ঃ- একটি (২০ মিগ্রা) বড়ি পরিষ্কার জলে অথবা মায়ের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবেন।
• শিশুর শৌচকর্ম করে দেওয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।
• এরফলে পরবর্তী কিছু মাস পর্যন্ত ডায়রিয়া এবং নিউমোনিয়া রক্ষা করে।
• জিঙ্কের অভাব পূরণ করে, ক্ষিদে এবং ওজন বৃদ্ধি করে।
• ডায়রিয়া হলে শিশুকে দুধ, তরল খাবার দেওয়া বন্ধ করবেন না।
জিংক
WHO ORS
ও.আর.এস/জিঙ্ক
আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড (আই.এফ.এ)
ডোজঃ
০৬-৫৯ মাস ঃ
•সপ্তাহে দু'বার ১ মিলি সিরাপ।
৫-১০ বছর ঃ
•সপ্তাহে একবার ১ টি ট্যাবলেট (গোলাপী রং)।
•১০-১৯ বছরে সাপ্তাহিক ১ টি ট্যাবলেট (নীল রং)।
কি করণীয় ঃ
•আয়রনযুক্ত আহার, ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ আহার।
অ্যালবেন্ডাজল ট্যাবলেট
কৃমিনাশ করতে ১ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত শিশুদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
বয়স
পরিমাণ
প্রয়োগ
১-২ বছর
অর্ধেক
অ্যালবেন্ডাজল ট্যাবলেট ৪০০মিগ্রা
২-৩ বছর
পূর্ণ
অ্যালবেন্ডাজল ট্যাবলেট ৪০০মিগ্রা
৩-১৯ বছর
পূর্ণ
অ্যালবেন্ডাজল ট্যাবলেট ৪০০মিগ্রা
Iron & Folic Acid Syrup
"নব প্রজন্মকে সুস্থ রাখার করে অঙ্গীকার রোগমুক্ত ত্রিপুরা গড়ার দায়িত্ব আমাদের সবার।"
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সত্য উন্মোচন করিবার সাহস

বলা হইয়া থাকে , সত্যকে কখনোও চাপিয়া রাখা যায় না। সত্য স্বপ্রকাশ। তাহা একদিন না একদিন উদ্ভাসিত হইবেই। তিরিশ বৎসর পূর্বে এই ভারতভূমিরই অংশ কাশ্মীরের নিরীহ পণ্ডিতদের উপরে জিহাদিদের আক্রমণ, হত্যা, বলাৎকার, সম্পত্তি দখল, সর্বোপরি তাহাদের কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত করিবার ঘটনা দেশের তৎকালীন শাসকবর্গ, দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যম এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা দেখিয়াও দেখিলেন না। তাহাদের নিজভূমে পরাধীন হইবার কথা কেহই বলিলেন না। কেহই বলিলেন না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি তাহা জনসমক্ষে আনিবার যথাসাধ্য প্রয়াস করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কণ্ঠস্বরকে বারবার চাপিয়া রাখা হইয়াছে। ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি হইতে কাশ্মীরের পণ্ডিতদের উপরে যে নৃশংস আক্রমণ শুরু হইয়াছিল তাহাতে কত নিরীহ মানুষকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে, কত মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে, তাহাদের বাড়িঘর জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সহায় সম্পদ সবকিছু দখল করিয়া তাহাদের বিতাড়িত করা হইয়াছে, তাহার হিসাব কেহ রাখে নাই। হাজার হাজার হিন্দু নিজের ভিটেমাটি হারাইয়া জম্মু ও দিল্লির শরণার্থী শিবিরে প্রাণটুকু বাঁচাইয়া কীভাবে দিনাতিপাত করিতেছে— তাহার খবর কেহ রাখে নাই। স্বাধীন ভারতে ইহা এক নির্মম ট্র্যাজেডি। ভণ্ড দেশপ্রেমিক কংগ্রেস ও দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা এই নির্মম সত্যকে চাপিয়া রাখিয়াছিল শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রাখিয়া। কিন্তু সত্য স্বপ্রকাশ। তাহাকে চাপিয়া রাখা যায় না। সম্প্রতি সত্যান্বেষী চলচ্চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর হাত ধরিয়া সেই চাপিয়া রাখা সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহার 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' চলচ্চিত্রটি স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে ঘটিয়া যাওয়া ভয়াবহ নরসংহার ও নিজভূমে বাস্তুহারা মানুষজনের এক করুণ কাহিনি।

চলচ্চিত্রটি দেশে-বিদেশে ঝড় তুলিয়াছে। লুকাইয়ে রাখা এক নির্মম সত্যকে বিশ্ববাসীর মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য মানুষ তাঁহাকে দুই হাতে আশীর্বাদ করিতেছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকমণ্ডলী ইহাকে বিনোদন হিসাবে না দেখিয়া তথ্যচিত্র হিসাবে দেখিতেছেন। বিবেক অগ্নিহোত্রী নিঃসন্দেহে একজন সাহসী চিত্র পরিচালক। তিনি বিশ্ববাসীর সামনে সত্য উন্মোচন করিয়াছেন। সত্য উন্মোচনের সাহস কতিপয় মানুষেরই থাকে। দেশ বিভাজিত হইবার পূর্বে কলিকাতা ও নোয়াখালিতে এবং বিভাজিত হইবার পরে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লিগের জিহাদিদের দ্বারা হিন্দুদের উপরে যে নৃশংস অত্যাচার হইয়াছে, তাহাদের স্বভূমি হইতে উৎখাত করা হইয়াছে, তাহা লইয়া তাবড় তাবড় চিত্র পরিচালক নিশ্চুপ রহিয়াছিলেন। বলিতে কোনো দ্বিধা নাই যে, প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকরা তাঁদের নির্মিত চলচ্চিত্রে ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র, সেই নরসংহারের নায়কদের মুখোশ খুলিবার সাহস দেখাইতে পারেন নাই। শ্যাম বেনেগাল, আদুর গোপালকৃষ্ণানরাও এই সাহস দেখাইতে পারেন নাই। বলিতে হয়, সত্য প্রকাশ না করিয়া টলিউড বলিউড যে পাপ করিয়াছে, বিবেক অগ্নিহোত্রী 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নির্মাণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পুষ্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনেতা অনুপম খের বলিয়াছেন, 'ইহা অভিনয় নহে, ইহা সত্যের প্রকাশ, ইহা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের অভিব্যক্তি।' বলাবাহুল্য, অনুপম খের একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত। ভারতের বর্তমান প্রজন্ম সত্য জানিতে চাহে। পরিচালক বিধু বিনোদের 'শিকারা'-য় প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই বলিয়া তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা। বিবেক অগ্নিহোত্রী কাশ্মীরি পণ্ডিতদের অভিব্যক্তিকেই প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিবেক অগ্নিহোত্রীকে প্রাণে মারিবার হুমকি দেওয়া হইতেছে। চলচ্চিত্রটির নিন্দা করিয়া মানুষকে তাহা না দেখিবার কথা বলিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া কলকাতায় একটি প্রেক্ষাগৃহে হামলা চালাইয়াছে মদ্যপ জেহাদিরা।

বিবেক অগ্নিহোত্রী তাঁহার দ্য কাশ্মীর ফাইলস প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালি হিন্দুদের চিন্তা-চেতনায় বোধ সঞ্চার করিয়াছেন। যেইভাবে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি এই পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও তৃণমূলিদের প্রত্যক্ষ মদতে জেহাদিদের স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা কাশ্মীরি হিন্দুদের মতো হইতে কতক্ষণ? তবে আশার কথা হইল, ১৯৯০ সালে দিল্লি ও কাশ্মীর দুইটিতেই রাষ্ট্রবোধহীন দুইটি দল ক্ষমতায় ছিল, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে স্বার্থসর্বস্ব ক্ষমতালোভী সরকার রহিলেও দিল্লিতে রহিয়াছে প্রখর রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন সরকার। তাহার সঙ্গে রহিয়াছে রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন বর্তমান নবপ্রজন্মের বাঙ্গালি যুবসমাজ।

সুভাষিতম্

সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনা বৃথা জপঃ।

সত্যহীনং তপোব্যর্থম্ ঊষরে বপনং যথা।।

ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করা যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনই সত্য বিনা পূজা, জপ ও তপও ব্যর্থ হয়।

‘দল বদলুদের’ আসানসোলে অগ্নিপরীক্ষা, বালিগঞ্জে নিয়মরক্ষা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আসানসোল লোকসভা আর বালিগঞ্জ বিধানসভা। অগ্নিপরীক্ষা আর নিয়মরক্ষার লড়াই। তবে মজার ব্যাপার দুটি কেন্দ্রেই শাসকদল তৃণমূলের প্রার্থী বিরোধী বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদ্বয় শত্রুঘ্ন সিনহা আর বাবুল সুপ্রিয়। ‘ছোট’ মন্ত্রী হয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তাঁদের ঠাঁই জোটেনি। তাই অভিমান করে শত্রুঘ্ন সিনহা প্রথমে কংগ্রেস আর পরে তৃণমূলের হাত ধরেছেন। বাবুল সোজা তৃণমূলের কোলে ঝাঁপিয়ে চলে গিয়েছেন। বাবুলকে বিজেপি থেকে তৃণমূলে ঠাঁই দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ‘বিহারিবাবু’ শত্রুঘ্নকে জায়গা করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সহ-সভাপতি যশবন্ত সিনহার পরামর্শে। বিহার অবশ্য তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় ৪৫ শতাংশ অবাঙ্গালি ভোটার। তাই মমতা বিহারিবাবুকে বাঙ্গলার রাজনৈতিক বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করতে আসরে নামিয়েছেন। তবে সে খেলায় তিনি কতটা সফল হবেন তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত শত্রুঘ্নের ‘দল বদলু’ তকমাই ভোটে তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আসানসোলে বিজেপির মুখ অগ্নিমিত্রা পল আর বালিগঞ্জে দলের একনিষ্ঠ কর্মী কেয়া ঘোষ। তৃণমূলের দুই পুরুষ আর বিজেপির দুই নারী। বিজেপি মহলে গুঞ্জন অগ্নিমিত্রার বদলে স্থানীয় জীতেন্দ্র তিওয়ারি বা নির্মল কর্মকারকে প্রার্থী করলে বিজেপি খানিকটা এগিয়ে থাকত। আমার মতে বিজেপি সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করেছে। কারণ দলবদলুর তকমা তিওয়ারির ওপরেও আছে। তবে শোনা যাচ্ছে অগ্নিমিত্রা জিতলে আসানসোল (দক্ষিণ) থেকে বিজেপি জীতেন্দ্রকেই আবার প্রার্থী করবে। তাই জীতেন্দ্র যে অগ্নিমিত্রার গোঁজ হবে না তা বলা চলে।

২০১৪ আর ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে প্রায় ৭০ হাজার আর ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ভোটে বিজেপির হয়ে জিতেছিলেন বাবুল। এই মুহূর্তে ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বিজেপির দখলে ৩টি আর তৃণমূলের ৪টি। আসানসোল পৌরভোটে বিজেপিকে ধুয়ে দিয়েছে তৃণমূল। ১০৬টি আসনের মধ্যে তারা জিতে নেয় ৯১টি আসন। বিজেপি পায় ৭টি আসন। আমার ধারণা বালিগঞ্জ আর আসানসোল অভিষেক আর মমতার আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জের লড়াই। সে লড়াই জিততে দু’জনেই মরিয়া। মমতা যদি ৩ বছরের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ভোটের ব্যবধান মিটিয়ে দিতে পারেন তাহলে মেনে নিতেই হবে মমতা ম্যাজিক জানেন। শান্তিপুরের উপনির্বাচনের আগে ৭ হাজার ভোটে পিছিয়ে থাকা তৃণমূলকে তিনি প্রায় ৬৫ হাজার ভোটে জিতিয়ে নিয়ে আসেন।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে ক্রমাগত হারতে থাকা রাজ্য বিজেপির কাছে আসানসোল অগ্নিপরীক্ষার ভোট। রাজ্যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। তৃণমূলের কাছে বালিগঞ্জ নিয়ম রক্ষার ভোট। কারণ বালিগঞ্জ তৃণমূলের ‘শিওর সিট’ বা নিশ্চিত আসন। আর আসানসোল তৃণমূলের লজ্জা নিবারণের চ্যালেঞ্জ। ২০১৪ আর ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির কাছে দু’বার হেরে যাওয়া আসানসোল আসন তৃণমূলের ‘ওয়াটারলু’। তবে এবার ওয়াটারলুর হিরো বিজেপির ‘ডিউক অব ওয়েলিংটন’ বাবুল সুপ্রিয় নিজেই নেপোলিয়ন অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে। মমতার হয়ে তিনি লড়ছেন বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে। শোনা যাচ্ছে মমতা আগামীদিনে তাঁকে মন্ত্রী করবেন। এমন কথাও রটছে যে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ বাবুলকে আগামীদিনে কলকাতার মেয়র করা হতে পারে। অভিষেকই বাবুলকে বিজেপি থেকে সরিয়ে এনেছিলেন। অনেকে বলেন মমতা ঘনিষ্ঠ অরূপ বিশ্বাসের কাছে টালিগঞ্জ থেকে হেরে যাওয়ায় বিজেপিতে খানিকটা ব্রাত্য হয়ে যায় বাবুল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ফিরে যাওয়া আটকে যায়। তারপর থেকেই পথ খুঁজতে থাকে বাবুল। বাবুলকে সে রাস্তা বাতলে দেন অভিষেক। সম্প্রতি রাজ্যের ভোট বাক্সে ৪ থেকে ১৪ শতাংশে উঠে বামপন্থীরা খানিকটা মাথা চাড়া দিয়েছেন। তবে আলোচনা করার মতো জায়গায় পৌঁছয়নি। তাই আপাতত দুটি ভোটেই ওদের তামাদি করে রাখছি। ২৬তম পার্টি কংগ্রেস নিয়েই তারা বেশি ব্যস্ত। বৃদ্ধাবাস সিপিএম-কে যুব আবসে গড়ার জন্য রাজ্য কমিটিতে তারা ৩০ শতাংশ নতুন মুখ আমদানি করেছেন। তবে শেষ রক্ষা হলে হয়। উপনির্বাচনের ফলাফল যাইহোক তা থেকে আগামীতে দুটি বিষয় নিশ্চিত করবে এ রাজ্যে বিজেপি কীভাবে বাঁচবে? আর তৃণমূলের রশি কার হাতে থাকবে? তাই আসানসোলে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর যেমন অগ্নিপরীক্ষা বালিগঞ্জে মমতার তেমন নিয়মরক্ষা। □

> **উপনির্বাচনের ফলাফল যাইহোক তা থেকে আগামীতে দুটি বিষয় নিশ্চিত করবে এ রাজ্যে বিজেপি কীভাবে বাঁচবে? আর তৃণমূলের রশি কার হাতে থাকবে?**

মা-মাটি-রক্ত

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া
দিদি,

জানি, খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তবু আমার প্রণাম নেবেন। আমি যখন চিঠি লিখছি তখন সামনে টিভি খোলা। দেখছি রামপুরহাটে আগুন জ্বলছে। টিভিটা বন্ধ করে দিলাম। না, আর ভালো লাগছে না দিদি। নিজেদের মধ্যে এই মারামারি আর ভালো লাগছে না। তৃণমূলের পঞ্চায়েত নেতা খুন হয়েছেন। অভিযুক্ত তৃণমূলের লোকেরাই। তৃণমূল সমর্থকদের দোকান, বাড়ি পুড়ছে। আগুন লাগাচ্ছে তৃণমূলের লোকেরাই। তৃণমূলই এখন তৃণমূলকে পুড়িয়ে মারছে।

এই এখনই আর একটা চ্যানেলে অন্য খবর দেখাচ্ছিল। বালিগঞ্জে তুমুল মারামারি হচ্ছে। সেটাও তৃণমূল বনাম তৃণমূল। দলেরই কাউন্সিলারের স্বামীকে পেটাচ্ছে তৃণমূলের ছেলেরা। রক্ত ঝরছে মাথা থেকে। জামাটা রক্তে ভিজে গিয়েছে। বালিগঞ্জের উপনির্বাচনে বাবুল সুপ্রিয় গান গেয়ে গেয়ে প্রচার করবেন ভেবেছিলেন কিন্তু রক্ত দেখে তাঁর কেমন লাগছে কে জানে! তবে আমার একদম ভালো লাগছে না। একদমই না। দিদি রামপুরহাটের ঘটনা নিয়ে সিট গঠন করলেও সমস্যা মিটবে কিনা কে জানে!

সেই বিধানসভা নির্বাচনের পরে থেকে রাজ্যে সন্ত্রাস চলছে। বিজেপি কর্মীদের খুন করা হচ্ছিল দেখে এতটা খারাপ লাগেনি। বিরোধী রাজনীতি করলে যে মরতে হয় সেটা বাঙ্গলার বাসিন্দা হিসেবে দেখে দেখে অভ্যস্ত। সেই বাম আমল থেকে দেখে আসছি। কিন্তু দিদি এসব কী হচ্ছে? এই তো সেদিন দেখলাম পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলারকে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে একজন মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে দিল। ভাবা যায়! দিদি, আপনি জানেন যে স্থানীয় তৃণমূলের কোনও অংশের নেতা, কর্মীদের সমর্থন না থাকলে এই ভাবে প্রকাশ্যে তৃণমূলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে খুন করা যায় না। এর আগে দিদি, ভদ্রেশ্বর পুরসভার তৃণমূলেরই চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়কে এই ভাবে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। তখনও দেখা যায়, তৃণমূলের ভিতরের গোলমালেই মনোজ মারা গিয়েছেন।

আবার দিদি পুরুলিয়ার ঝালদার ঘটনাই যদি দেখেন, তবে ওখানে কংগ্রেসের নেতা খুন হয়েছেন। অভিযুক্ত তাঁরই তৃণমূল নেতা ভাইপো। যে ভাইপো গত পুরভোটে কাকার কাছে পরাজিত হয়েছেন। এসব কী হচ্ছে দিদি! আমার তো মাথা ঠিক থাকছে না। আপনি কী করে সামাল দেবেন ভাবতেই পারছি না।

দিদি গো, ভাইয়ে ভাইয়ে এই লড়াই দেখেও কিন্তু তৃণমূলের আর কেউ আমার মতো চিন্তিত নয়। কারণ, তাঁরা সকলেই এটা ভাবছেন যে, নিজে বাঁচলেই হবে। আসলে পুরভোটে যে ভাবে যা খুশি করে জেতার নির্দেশ দিয়েই আপনি ভুল করেছেন। বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে যাঁরা যেতেন তাঁরা পুরভোটে জয়ীদের ভরসাতেই বাজিমাত করেন। ফলে বিধায়ক, সাংসদরা কিছু বলেননি। আর আপনিও জানেন এরাই দলের সম্পদ। ঠিক যেমন করে এক সময়ে সিপিএম তপন-সুকুরদের দলের সম্পদ মনে করত।

আসল কারণটা দিদি আপনি ভালোই জানেন। তবু একবার মনে করাই। পুরসভায় জয় মানে আসলে কামাইয়ের রাস্তা। সবচেয়ে বেশি কামাই তো পুরসভার জনপ্রতিনিধিদের থেকে। বড়ো আবাসন থেকে কাঁচা নর্দমা সব কিছু থেকেই আয়। কেন্দ্রের হোক বা রাজ্যের প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া থেকে আয়। আপনি নিজে মুখেই একবার বলেছিলেন দলের একাংশের জনপ্রতিনিধি পাড়ায় কারও মৃত্যু হলে 'সমব্যথী' প্রকল্পের দু' হাজার টাকা থেকে কাটমনি খায়। আপনি চেষ্টা করেছেন কিন্তু বন্ধ করতে পারেননি। আসলে পারবেন কী করে! যাঁরা ওই কটমানি খায়, তাঁরা যে সবাই দলের সম্পদ। 'সমব্যথী' প্রকল্পের সামান্য টাকা থেকে যাঁরা কমিশন নেন তাঁরা প্রেমোটারদের থেকে কত নেন বুঝতে পারছেন! কন্যাশ্রী থেকে বিধবা ভাতা, প্রধনমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে সড়ক, নিকাশি, নির্মাণ, সব থেকেই আয় আর আয়। লুটেপুটে নেওয়ার এমন সুযোগ যেখানে সেখানে কি কে আপনার, কে পর তা মাথায় থাকে? নিজের টুকু নিশ্চিত করতে তাই আপাতত বিরোধী নয়, দলের মধ্যে অপর পক্ষই টার্গেট।

চিঠি লম্বা করব না। শুধু গত ১৬ মার্চ ঘটা কালনা পুরসভার একটা ঘটনার বিবরণ দেব। পুরবোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে টানটান উত্তেজনা। কোনো পক্ষই একে অন্যকে জায়গা ছাড়তে নারাজ। দল যাঁকে পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেছে, তাঁকে পছন্দ নয় অন্য পক্ষের। এর মধ্যেই কাউন্সিলর অনিল বসু প্রতিবাদ জানাতে এক কাণ্ড করে বসেন। পুরসভা ভবনের দোতলা থেকে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। পুরভবনের বারান্দার রেলিঙে উঠে গিয়েছিলেন তিনি। প্রায় ঝাঁপ দিতে যাবেন, তখনই তাঁকে সময় মতো আটকে দেন সেখানে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। □

স্পিলবার্গ দেখালে শিল্প, বিবেক দেখালে প্রোপাগান্ডা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯০ সালে কট্টরপন্থী-সহ আপামর মুসলমান কাশ্মীরবাসীর যোগসাজশে সেখানকার সংখ্যালঘু কিন্তু প্রাচীনতম বসবাসকারী হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নৃশংস বিতাড়নের সত্য ইতিহাস উদ্ঘাটনের 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নামে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেয়েছে। ছবিটির মুক্তি নিয়ে এক ব্যাপক জনকৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। চলচ্চিত্র মহলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অতিমারীর কারণে দীর্ঘ দু' বছর ব্যাপী দর্শক বঞ্চিত প্রেক্ষাগৃহগুলি হঠাৎ ঝলমলে হয়ে উঠেছে। ছবিটি মানুষের সত্যাকাঙ্ক্ষায় ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছে। আজকাল মাল্টিপ্লেক্সগুলিতে ভালো দাম দিয়ে টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে হয়। অনেক সাধারণ দর্শকই তা করে উঠতে পারেন না। গতকাল শিয়াখালার দিকে গিয়েছিলাম সেখানে দীর্ঘদিন পরে দেওয়ালে দেখলাম পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শ্রীরামপুর টকিজে চলছে 'কাশ্মীর ফাইলস'। অবাক হয়ে গেলাম। ছবিটিকে নিয়ে টিভির আলোচনাগুলিতে তুলকালাম হচ্ছে। মোল্লার দল, কট্টর ইসলামপন্থীদের মধ্যে কোনো অপরাধবোধ থাকা যে তাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় না তা বারবার দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন এই ৩২ বছর পরে এমন ঘটনা প্রকাশ্যে এনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও হিংসা ছড়ানোর চক্রান্ত করা হয়েছে।

'সিন্ডলারস লিস্ট' ছবির একটি দৃশ্য।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র 'Schindlers List' চলচ্চিত্রটির কথা প্রাসঙ্গিক। ১৯৪০-এর ইহুদিদের বিরুদ্ধে হিটলারের নির্মমতা, গ্যাস চেম্বারে মৃত্যু, দাঁড়িয়ে গুলি করে খুন সবই সেই ছবিতে উঠে এসেছিল। সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে নাজি 'হলোকাস্টের' সেই ছবি চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান একাধিক অস্কারে ভূষিত হয়। বিশ্বযুদ্ধে জার্মান অমানবিকতার ছবি যদি ৬৫ বছর পরে পৃথিবী ব্যাপী আলোড়ন ফেলতে পারে, দ্য কাশ্মীর ফাইলসে দীর্ঘ সঙ্গোপনে রাখা সত্য উন্মোচন কোন অপরাধের মধ্যে পড়ে? এটি যে সত্যনির্ভর তা প্রথমেই নানান ছবি ও সংবাদসংবলিত তৎকালীন তিনটি ফাইলে দেখানো হয়েছে। ছবির শুরুর সময়েই ক্রীড়ারত কিশোরদের বলা হচ্ছে 'ইন্ডিয়ান ডগস'। এই ঘৃণার উৎসারই ছবিময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সারদা পণ্ডিত নামে ছবির প্রবীণ চরিত্র পুষ্কর পণ্ডিতের পুত্রবধূর দেহকে করাতকলে কেটে দু' খণ্ড করার মতো নির্মমতা সম্ভবত হিটলারও দেখাতে পারেননি। সেই সময়কার মিডিয়াও যে সরকারি চোখ রাঙানির কারণে মুখ খুলতে পারেনি প্রবীণ সাংবাদিক বিষ্ণু তা অশ্রুসিক্ত চোখে ব্যক্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাকে রেসিডেন্ট কমিশনার ব্রহ্ম দত্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন এই নৃশংস ঘটনার সম্ভাব্য বিপদ প্রতিরোধ করতে। আবদুল্লা সরাসরি তাকে ভৃত্যের মতো সাস্‌পেন্ড করে দিয়েছেন এই বলে যে কাশ্মীর হিন্দু কুত্তাদের জন্য নয়। অথচ ইতিহাস বলছে অন্তত ৪০০০ বছর ধরে ভারতমাতার বংশজ কশ্যপমুনির দেশ কাশ্মীর (কলহনের রাজতরঙ্গিণী)। এই ব্রাহ্মণ কশ্যপমুনিই কাশ্মীরি পণ্ডিতদের আদি পুরুষ। একথা ছবির শেষ অংশে আদ্যন্ত ভুল বোঝানো কৃষ্ণের (জেএনইউ ছাত্র) মোহভঙ্গকালীন পরবর্তী বক্তৃতায় রয়েছে। পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী জেএনইউ- এর ছাত্রদের মস্তিষ্ক প্রক্ষালনকারী কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদীদের নিয়োজিত চর অধ্যাপিকা রাধিকা চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে এবং হাতেনাতে তাঁর ঘৃণ্য চক্রান্ত উন্মোচিত হওয়ার বিদায় দৃশ্যটি চমৎকার চিত্রায়িত

করেছেন। এমন কানহাইয়ারূপী এখনও রয়ে গেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রধানত 'হলোকাস্ট' নামে হিটলারের যে নরসংহারের কথা বলা হয় সেখানেও Fredrick forsyth-এর (শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত) বইতেও দেখানো হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা হিটলারকে ঘৃণ্য মানুষ বলে চিহ্নিত করে ইহুদিদের কাছে ক্ষমা চাইছে। এই নির্মমবাদীরা এখনও তর্ক চালিয়ে নতুন তত্ত্ব দিচ্ছে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকে হিন্দুদের মেরেছে, কিছু কিছু মুসলমান পরিবারও হিংসার শিকার হয়েছে। বাঃ! অগ্নিহোত্রী দেখিয়েছেন একই সঙ্গে খেলাধুলো করা পাশের বাড়ির লোক দেখিয়ে দিচ্ছে পুষ্কর পণ্ডিতের (অনুপম খের) ছেলে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচতে চালের ড্রামে লুকিয়ে আছে। ইয়াসিন মালিক চরিত্রের অভিনেতা ড্রামের ওপর অজস্র গুলিবর্ষণ করে স্ত্রী ও পিতার সামনে তার মৃত্যু ঘটিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। তারা সেই রক্তমিশ্রিত চাল স্ত্রীকে খেতে বাধ্য করেছে। অসহায়, মৃত্যু দর্শনের নৃশংসতার শেষ সীমায় পৌঁছানো অনুপম খের এখানে অনবদ্য। এই দৃশ্যের জের টেনে একেবারে শেষে সারদা পণ্ডিতকে (সন্তানহারা সেই মা) বেআব্রু করে তাকে জনসমক্ষে ঘোরানো ও ধর্ষণের পর তাঁকে করাতকলে কাটা হয়, তার আগে ভয় দেখানো হয় এবার ছেলের রক্তমাখা ভাত খাওয়ানো হবে। এই সমস্ত দানবীয় ইতিহাস নিয়ে আলোচনা উসকে দেওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। 'তোমারও প্রকাশ হোক সূর্যের মতো'। ছবির শেষে আমি নিজের মতো প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করছিলাম বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না ছেলে, বুড়ো, তরুণ, মহিলা মিলিয়ে অন্তত চল্লিশজন দর্শক জানাচ্ছিলেন 'আঙ্কেল ইয়েভি হামারা ইধার ভি হো সকতা হ্যায় না?' কী বলবেন উত্তর তো একটাই হবে 'জরুর'।

আজও বিন্দুমাত্র অনুশোচনার বদলে আলোচনা চলেছে ঠিক ওই সময়ে বিজেপির সমর্থনে ভিপি সিংহের সরকার চলছিল। হ্যাঁ, ঠিকই তার বয়স তখন ১ মাস হয়েছে। এই চক্রান্ত তখন বহু পথ পেরিয়ে এসেছে। ইসলামে রয়েছে 'গনিমতের' মাল ভোগ করার, ধ্বংস করার অধিকার বিজয়ীর রয়েছে। কাশ্মীরে বসবাসকারী প্রাচীন হিন্দুদের বাসভূমি হাজার হাজার বিঘা জমি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের পরিবারের মেয়েদের ছেড়ে যাওয়ার যে ডাক মসজিদ থেকে দেওয়া হয়েছিল তা যে আক্ষরিক সত্যি, অগ্নিহোত্রী বাপের বেটার মতো তা দেখিয়ে মুসলমান গরিষ্ঠাংশ ভারতের মানুষকে সাবধান করে দিয়েছেন। সংখ্যায় বেড়ে গেলে অর্থাৎ 'দার-উল-ইসলাম'-এর উদ্দেশ্য সফল হলে আমাদের এখানে দাল-উল হারাব চলছে (বিধর্মীর দেশ) তারা কাউকেই ছাড়বে না। পরের সম্পত্তি ও নারী হরণে তারা ধর্মের আশ্রয়ে প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতা প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। এটি তুলে ধরাই অগ্নিহোত্রীর ছবির সারাংশ। প্রথম দিকে আল্লা হো আকবর যুদ্ধ আহ্বান দেওয়ার সঙ্গে কাশ্মীরের আরাধ্য দেবতা শিবের (পুষ্কর পণ্ডিতের বড়ো ছেলের নামও শিব) ছবি দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ শুধু জমি ও নারী কেড়ে নেওয়া নয়, আরাধ্য দেবতাকেও ভূলুণ্ঠিত করে কাফের দূরীকরণের ঘৃণাই সন্ত্রাসীদের উপজীব্য। ১৩০০ বছর আগে কাদের খান দেবসার পাশে কয়েক হাজার হিন্দু ব্রাহ্মণকে জ্বলন্ত উনুনে বসিয়ে পুড়িয়ে মারার পর অঞ্চলটি কাশ্মীরি ভাষায় বাটাসাগান বা ব্রাহ্মণদের মৃত্যু উপত্যকা নামে পরিচিত। তাই হিন্দু বিতাড়ন একটা উত্তরাধিকার মাত্র।

চোখের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে শেষ দৃশ্যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া ও স্থানচ্যুত অনুপম খেরের চার বন্ধু কমিশনার মিঠুন, পুলিশ প্রধান পুনিত ইশার, ডক্টর শর্মা (যাকে হিন্দুদের চিকিৎসা করতে বারণ করা হয় ও এক হিন্দু রোগীর রক্ত দানের সময় নল খুলে দিয়ে মৃত্যু ঘটানো হয়) এবং হতমান সাংবাদিক বিষ্ণু অনুপমের ভগ্নপরিত্যক্ত গৃহে শিবমূর্তি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন ও পাকিস্তানের পতাকা খুলে ফেলে দেন। অনবদ্য মুনশিয়ানায় ডকুমেন্টেশনের সঙ্গে নান্দনিক চলচ্চিত্রের মিসেল ঘটানোর ঝুঁকি নিয়েছেন অগ্নিহোত্রী। এই ঝুঁকি না নিলে আমরা কেউই থাকব না।

'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবির একটি দৃশ্যে সারদা পণ্ডিত।

পাত্রী চাই

পাল, পুঃবঃ, ৩৮+/৫'১০"/ নর MVA (ফাইন আর্টস) গ্রাফিক ডিজাইনার, নিজস্ব এডিটিং হাউস, ডিডি নিউজ-এ ভিডিও এডিটর। শিক্ষিতা ঘরোয়া সুশ্রী দেব/নর অনূর্ধ্ব ৩৩ পাত্রী চাই।

মোঃ ৬২৯১২০৬৬১৬

প্রতিটি বাঙ্গালি হিন্দুর কাশ্মীর ফাইলস দেখা উচিত

লেখক ও চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত দ্য কাশ্মীর ফাইলস এই মুহূর্তে সিনেমার পরিভাষায় বক্স অফিসে চূড়ান্ত সফল। এবং এই সাফল্য সারা ভারত জুড়েই। কিছু আনুকূল্য অবশ্য সিনেমাটির ভাগ্যে জুটেছে। যেমন ভারতের বিজেপি শাসিত প্রদেশগুলিতে এই ফিল্মটি সম্পূর্ণ বিনোদন করমুক্ত। এখন দেশের অন্যান্য অবিজেপি শাসিত রাজ্যেও এই চলচ্চিত্রটিকে বিনোদন করমুক্ত করার দাবি উঠছে। বিজেপি বিরোধীরা বিশেষ করে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা বলতে শুরু করেছেন, এই ফিল্মে একটি রাজনৈতিক বার্তা আছে। তাই এর বিনোদন কর মকুব ও এটা ওই চলচ্চিত্রটির এই বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণও। ঠিক যে এই সিনেমাটির মধ্যে একটি বার্তা আছে। তবে তা নিছক দেশের পলিটিক্সের নয়, বরং এই বার্তা গভীরভাবে দেশের সামাজিক অবস্থা ও ইতিহাসের প্রতি বার্তা। এতকাল বিকৃত ইতিহাস পড়িয়ে আর ধর্মনিরপেক্ষতার খোয়াব দেখিয়ে যে সত্যকে এতকাল আড়াল করা হয়েছিল, তা প্রকাশ্যে এলে কষ্ট তো হবেই। নব্বইয়ের দশকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর ভয়ংকর অত্যাচার, গণহত্যা চালিয়ে, ইংরেজি পরিভাষায় যাকে জেনোসাইড বলা হয়। যেভাবে তাদের কাশ্মীর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, যাকে ইংরেজিতে বলে এক্সোডাস, এই সিনেমার পটভূমি। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি মাত্র বছর ত্রিশেক আগে ঘটে যাওয়া আখ্যানের নারকীয়তা দেখতে দেখতে শিউরে উঠেছে। এক চলচ্চিত্র নিজগুণে ডকুমেন্টারির ভূমিকা পালন করেছে। একটা উদাহরণ দিই। কৃষ্ণা পণ্ডিতের মায়ের ঘটনা হিসেবে চলচ্চিত্র নিজগুণে ডকুমেন্টারির ভূমিকা পালন করেছে। একটা উদাহরণ দিই। কৃষ্ণা পণ্ডিতের মায়ের ঘটনা হিসেবে চলচ্চিত্রে যা দেখানো হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে গিরিজা টিক্কুর ঘটনা, যাকে দশদিন গণধর্ষণ করে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে যার শরীর চিরে দু'টুকরো করে ফেলে দেওয়া হয়। এইরকম অজস্র বীভৎসতা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর সেদিন সংঘটিত হয়েছিল। সারা দেশের কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালি এর একবর্ণও সেদিন জানতে পারেনি। যখন বছর আড়াই আগে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করলো কেন্দ্রীয় সরকার, তখন এটা রাজনৈতিক কূটতর্কের বিষয় মনে করে সে রাজ্যে হিন্দু পণ্ডিতদের ওপর বর্বরতার কিছু কথা শুনেছিল মাত্র।

সকল ভারতবাসীর এই ফিল্ম দেখা উচিত, আত্মসচেতনতা ও আত্মপলব্ধির স্বার্থেই। তবে সর্বাগ্রে বাঙ্গালি হিন্দুর এই ছবি দেখা উচিত। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাঁদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়নের মধ্যে হিন্দু তাঁদের দেশত্যাগের মিল খুঁজে পেতে পারেন। বিশেষ করে বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিই, পঞ্জাবে যেভাবে সম্পূর্ণ জনবিনিময় হয়েছিল, বাঙ্গলায় বাঙ্গালি হিন্দু দেশভাগের দেশত্যাগের সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি আজও জীবনের প্রতিপদে অনুভব করছে। কিন্তু তাদের সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে এই বাস্তবের প্রতিফলন খুব কমই হয়েছে। কারণ সেকুলারিজমের মন্ত্রে তাঁদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই কাশ্মীর ফাইলস আসলে তাঁদের ঘুম ভাঙানিয়া।

> সেকুলারিজমের মন্ত্রে বাঙ্গালি হিন্দুদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' আসলে তাঁদের ঘুম ভাঙানিয়া।

প্রাচীনকাল থেকে বহিরাগত ইসলামি আক্রমণে ভারতবর্ষ অজস্রবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। স্বাধীনোত্তর কালেও সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা চলচ্চিত্রে, উপন্যাসে, গল্পে দেশভাগের সমস্যার, উদ্বাস্তু মানুষের যন্ত্রণার কথা এসেছে। কিন্তু তার শিকড়ে পৌঁছনোর কথা বলা হয়নি। কারণ তাহলে নাকি সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হবে। রবীন্দ্রপ্রেমে আকুল বাঙ্গালি কিন্তু বোঝাপড়া কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ক্ষণিকা কবিতায় মূল্যবান সেই উক্তিকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি :

'মনে রে আজ কহ যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যরে লও সহজে।'

সত্যকে সহজে নেওয়ার এই শিক্ষা হিন্দু বাঙ্গালি আদৌ পাবে কিনা বা কাশ্মীর ফাইলস বাঙ্গালি হিন্দুর আই ওপেনারের কাজ করবে কিনা তা সময়ই বলবে। তবে বাঙ্গালি হিন্দু নিছক বিনোদনের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এই ফিল্ম দেখছে। গত ১১ মার্চ যখন ফিল্মটি রিলিজ হয়, তখন হাতে গোনা দু'তিনটি হলে সিনেমাটি চলছিল। রাজনৈতিক বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শুরুর সাতদিনের মধ্যে দুশোর বেশি হলে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। নিঃসন্দেহে একে গতি দান করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিরোধী দলের সমস্ত বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে। তবে সব কিছুর শেষে হিন্দু বাঙ্গালির আত্মচেতনা, আত্মোপলব্ধি চাই।

মোদী উত্তরপ্রদেশে ভোটের ব্যাকরণ বদলে দিয়েছেন

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

উত্তরপ্রদেশের ভোটাররা ২৫ বছর পর একটি দলকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার জন্য ভোট দিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছেন। যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের জয় বিশাল, কারণ এটা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমারেখা অতিক্রম করেছে। ২০১৭ সালে এই দল যে ভোট পেয়েছিল সেই ভোটের অঙ্ককে কিছুটা ছাড়িয়েও গেছে। একটা ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সত্ত্বেও এটা অর্জন করা জনগণের দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজবাদী পার্টি আর তার নেতা অখিলেশ যাদবও ভালো ফল করেছে। তার ভোটের প্রায় ২৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩২ শতাংশ হয়েছে, অর্থাৎ ৪ শতাংশের বেশি ভোট অর্জন করেছে মূল নেতা মুলায়ম সিং যাদবকে ছাড়াই। তাদের পরিবারে বিদ্রোহও হয়েছিল। মুলায়মের পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব-সহ তাদের বহু সদস্য বিজেপিতে চলে গেছে। অখিলেশ হেরে গেলেও বলা যায় দুটো বড়ো দলেরই ভোটের হার বেড়েছে।

এই নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃতি ছিল দুমুখো। এক প্রান্তে বিজেপি, আপনা দল ও নিষাদ পার্টির জোট; অন্যদিকে ছিল সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় লোকদল, সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি ও অন্য ছোটো ছোটো দল। লড়াই ছিল কঠিন। অনেকেই ভোটের ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু বিজেপি কেন জিতেছে সেই প্রশ্ন অনেকের মনে ঘুরছে আর সেটার উত্তর দেওয়া দরকার। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, পথে ঘোরা গবাদি পশুর সমস্যা, করোনা মহামারি সময়কার ক্ষোভ, বিশেষ করে শ্রমিকদের দুর্দশা এসব কারণে ভোটাররা যোগীর কাছ থেকে সরে যেতে পারত। কেন যায়নি? এর উত্তর দেওয়ার জন্য, মানুষকে সাধারণভাবে ভারতের রাজনীতিতে এবং বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে যে রূপান্তর ঘটেছে তা বুঝতে হবে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংসদীয় এলাকা বারাণসী সেটা ভুললে চলবে না।

মোদীর আগমনের পর থেকে উত্তরপ্রদেশ তিনটে বড়ো পরিবর্তন দেখেছে। এক, বর্জনমূলক রাজনীতি থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতিতে অভিযাত্রা। দুই, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের বদলে দীর্ঘকালীন আরও বড়ো প্রত্যাশামূলক রাজনীতিতে উত্তরণ এবং তিন, জাতপাত বাদ দিয়ে শ্রেণীগত রাজনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ। আর এসবই করা হয়েছে

> কংগ্রেস ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা উত্তর প্রদেশে প্রসাধনী ও মৌসুমি রাজনীতি করছে। তৃণমূল স্তরে তাদের সংগঠন নেই। নেতৃত্ব দিশাহীন ও আদর্শহীন। একটি প্রাচীন দল সাম্প্রতিক ভোটে শুধু উত্তরপ্রদেশেই নয়, অন্যত্রও সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে। দুটি আপাতদীর্ণ দল এসপি এবং বিএসপি রাজনীতি ও কল্যাণবাদের যে পথ নিয়েছিল তা ছিল বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ যা স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ও অদক্ষতাকে প্রশ্রয় দিত আর সেই সঙ্গে অপরাধীদের বুক ফুলিয়ে দাপিয়ে বেড়ানোর সুবিধা করিয়ে দিত। দুর্নীতির বিষয়ে মোদীর শূন্য সহিষ্ণুতার ফল ভোটারদের মনে প্রভাব ফেলেছে। আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে যোগীর কঠোর অবস্থান, এমনকী 'বুলডোজার বাবা' নামে ব্যঙ্গ করা হলেও যোগী সেই ঝুঁকি নিয়েছেন। তাতে রাজ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তাকে নীরবে ভোটাররা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ জানিয়েছেন।

করোনা মহামারী উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করেছে, কিন্তু যোগীর উদ্ভাবিত 'ওয়ান ডিস্ট্রিক ওয়ান প্রোডাক্ট স্কিম' দরিদ্র কারিগরদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে যাদের উৎপাদিত পণ্য এখন রপ্তানি হচ্ছে। তাদেরও কিছু অর্থ উপার্জন হচ্ছে। এটা শুধুমাত্র তাদের স্বস্তি দেয়নি, রাজ্যের বাইরে থেকে বিনিয়োগকেও আকৃষ্ট করেছে।

কিন্তু মোদী-যোগীর মধ্যে আরও বেশি কিছু গুণ রয়েছে। তাঁরা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটি-র মাধ্যমে গরিবদের 'জন ধন' অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা সরাসরি পাঠিয়ে আর্থিক নিরাপত্তা, আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ফসল বিমা যোজনার মাধ্যমে শস্য সুরক্ষা এবং ভালো আইনশৃঙ্খলার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, রাজনীতির ব্যাকরণ ধীরে ধীরে বদলে দিচ্ছেন মোদী। এটা সমস্ত

ফঃ ২

জাতিবর্গকে সংযুক্ত করে তিনটে প্রধান শ্রেণীকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে — মহিলা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং নিম্ন শ্রেণীর গরিব মানুষজন। উজ্জ্বলা, বেটি বাঁচাও বেটিপড়াও, শৌচাগার নির্মাণ— এই সব কাজ তিনি মহিলাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে করেছেন। একইভাবে, তিনি প্রান্তিক কৃষকদের প্রতি সমানভাবে নজর দিচ্ছেন। তাদের অ্যাকাউন্টে বার্ষিক ৬ হাজার টাকা জমা করছেন এবং তাদের আয় বাড়াতে পারে এমন অন্যান্য সুবিধাও দিচ্ছেন। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে তথাকথিত কৃষক নেতাদের যে আন্দোলন হয়েছিল, তা সেখানে বিজেপির কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোদী-যোগী মিলে কৃষকদের জীবন উন্নত করার জন্য যে সব ব্যবস্থা নিচ্ছেন তার জন্য জনগণ সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সেই অঞ্চলে বন্ধ থাকা বহু আখমিল আবার চালু করা হয়েছে, নতুন নতুন আখমিল চালু হয়েছে এবং সমস্ত বকেয়া ঋণ অনেকাংশে পরিশোধ করা হয়েছে।

আবার পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জাটরাও ২০১৩ সালের দাঙ্গার ভীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কারণ তারা এখনোও আইনি ফাঁদে জড়িয়ে রয়েছে। তাদের অভিযোগ যে, তৎকালীন মন্ত্রী আজম খানের অঙ্গুলিনির্দেশে মুসলমানদের অখিলেশ যাদব ছাড় দিয়েছিলেন। এই কারণেই কানপুরের স্টাডি অব সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্স পরিচালিত নির্বাচনী সমীক্ষা দেখায় যে আগের বারের ৩৪ শতাংশের তুলনায় এবার ৭১ শতাংশ জাট বিজেপিকে ভোট দিয়েছে এবং তৃতীয় শ্রেণীর নিম্নবর্গীয় গরিবরা গত দু'বছর ধরে বিনা মূল্যে রেশন পাওয়ায় খুব খুশি। তারা স্বীকার করেন যে, করোনা মহামারীর সময় যোগী সরকার তাদের নিরন্ন থাকতে দেয়নি। সুতরাং মোদী-যোগী নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপিকে নতুন স্তরে উন্নীত করে মহিলা, ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্রদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর শ্রেণীর নির্বাচনী এলাকাগুলিকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি মহিলা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, দলের স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোটার ছাড়াও রয়েছে একটা বড়ো অংশ 'মোদী ভোটার'। ২০১৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি উত্তরপ্রদেশে ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, সেখানে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে পেয়েছে ৫০ শতাংশ। স্পষ্ট দেখা যায় যে, ৯ শতাংশ অতিরিক্ত ভোট পেয়েছিল বিজেপি।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১১ শতাংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন শুধুমাত্র মোদীর কারণে। এটা একটা এক্স ফ্যাক্টর যা বিজেপিকে লাভান্বিত করেছে। মোদী তাঁর 'মন কী বাত'-এর মাধ্যমে সপ্রতিভ রাজনীতি এনেছেন, সেখানে তিনি রাজনীতি নিয়ে একটিও কথা বলেন না। প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে সংযোগ গড়ে তুলেছেন, আর এভাবেই তিনি অর্জন করেছেন যাকে 'মোদী ভোটার' বলা হয়।

তবে অবাক করার মতো বিষয় হলো মায়াবতীর সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁর মূল সমর্থক জাটভ দলিতদের অনেকেই এখন অন্য দলকে ভোট দিয়েছেন। সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ৮৫ শতাংশ জাটভ মায়াবতীকে ভোট দিত, এবার মাত্র ৪০ শতাংশ ভোট দিয়েছে। বাকিরা বেশিরভাগ বিজেপিকে এবং অন্য কিছু এসপিতে চলে গেছে। এটি তাঁর দলিত রাজনীতির শেষের লক্ষণ। কারণ অনেকেই এখন বিশ্বাস করে যে, বিজেপি তাদের ভালোভাবে দেখভাল করছে। সেই কারণেই সংরক্ষিত আসনের অধিকাংশ দলিত সাংসদ ও বিধায়কই বিজেপির হাতে।

কংগ্রেস ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা উত্তর প্রদেশে প্রসাধনী ও মৌসুমি রাজনীতি করছে। তৃণমূল স্তরে তাদের সংগঠন নেই। নেতৃত্ব দিশাহীন ও আদর্শহীন। একটি প্রাচীন দল সাম্প্রতিক ভোটে শুধু উত্তরপ্রদেশেই নয়, অন্যত্রও সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

তবু যোগী সরকারের সামনে অনেক সমস্যা। আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, কারিগরদের উৎসাহ দান এবং আরও অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা এনে সরকারকে বাকি জনগণের কাছে পৌঁছতে হবে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি, তাই সেদিক থেকে এই ভোট সতর্কবার্তাও বটে। ◻

With Best compliments from -

A
Well
Wisher

সৃষ্টির জগৎকে রাজনীতিমুক্ত না করলে বইমেলা বাঁচবে না

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

৪৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা সবে শেষ হলো। ১৯৭৬ সালে ময়দানে এখনকার মোহরকুঞ্জে প্রথম বইমেলা শুরু হয়। এটি প্রথমে ছিল কলকাতাস্থিত পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই মুহূর্তে বইয়ের সম্ভারে এই আন্তর্জাতিক বইমেলা ফ্রাঙ্কফুর্ট ও লন্ডনের বইমেলার পরেই। জনসমাগমের হিসেবে কুড়িলক্ষের বেশি হওয়ায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক বইমেলা।

আমি ১৯৭৬ সাল থেকে টানা প্রায় ত্রিশ বছর প্রতিটি বইমেলায় উপস্থিত থেকেছি। মেলার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহমর্মিতা পোষণ করে বই পড়া ও কেনার আনন্দ উপভোগ করেছি। মনে আছে, ১৯৭৮ সালে, ভারতীয় আর্কিটেকচারের উপর একটি মূল্যবান প্রামাণ্য বই এক স্টলে রোজ গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তাম। কেউ আমায় বাধা দেয়নি— কেউ এগিয়ে এসে বলেনি, বইটা দেব? অর্থাৎ, 'না কিনলে সরে পড়ুন' গোছের ভাব— যা পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছে। মেলার শেষ দিনে বইটা পড়ে যখন যথাস্থানে রাখছি, একজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনার পড়া শেষ হলো?' আমি তৃপ্তির হাসি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি হেসে বললেন, 'আমরা লক্ষ্য করেছি, আপনি রোজ এসে বইটা পড়েন। আপনার সুবিধার জন্য আমরা এই বইটা একই জায়গায় রেখেছি'। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে বললাম, 'ধন্যবাদ। আসলে এত দামি বই কেনার ক্ষমতা আমার নেই। তাই রোজ এসে আমি বইটা পড়ে নিলাম'— এই ছিল বইমেলার মর্মার্থ। তখন বইমেলায় প্রবেশমূল্য লাগত পঞ্চাশ পয়সা! পরবর্তী সময়ে প্রবেশমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিজন টিকিটের বন্দোবস্ত হয়। ধীরে ধীরে বইমেলার কলেবর স্ফীত হতে থাকে। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, যা রাজনীতির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের আবহে এ রাজ্যে প্রসার লাভ করে, তা বইমেলাতেও ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হতে থাকে। ক্রমশ শুধু পাঠক নয়, উদ্যোক্তাদের চিন্তাধারায়ও অনেক পরিবর্তন আসে। ময়দানের পর, মিলনমেলা ঘুরে, এখন

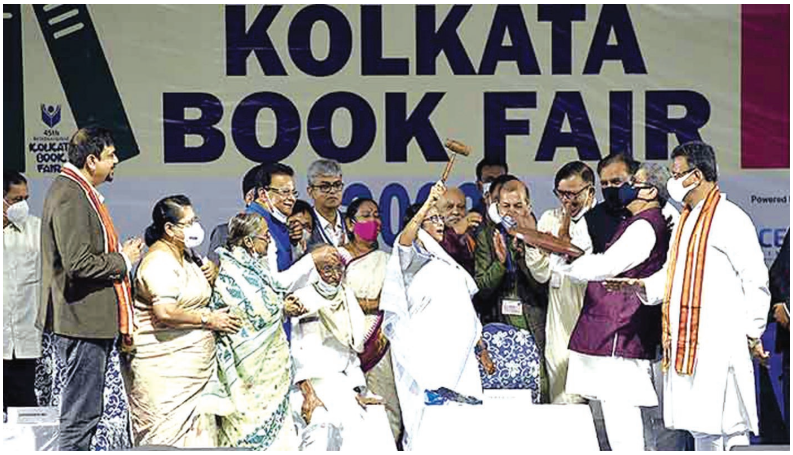

কলকাতা বইমেলার স্থায়ী জায়গা হয়েছে সেন্ট্রাল পার্ক, বিধাননগর। বেশ কয়েকবছর হয়ে গেল মেলায় ঢুকতে কোনো প্রবেশমূল্য লাগে না। আগে মেলার পাশে নির্ধারিত স্থানে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা ছিল— ঘণ্টাপ্রতি কুড়ি টাকা হিসেবে। এবারের অভিজ্ঞতা, মেলার উলটোদিকে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পার্কিং এরিয়া— সত্তর টাকা ঘণ্টা, কোনো রসিদ দেওয়া হয় না! এটা সরকার, পুলিশ ও গিল্ডের অগোচরে হয়েছে বলে কি মনে হয়? আসলে মেলা এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদের চরিত্র বদল হয়েছে। প্রথমে এই মেলায় স্টল দেওয়া যেত একমাত্র পাবলিশার হলেই— সাধারণ বই বিক্রেতাদের স্টল দেওয়ার সুযোগ ছিল না। ২০০০ সাল থেকে শুধু পাবলিশার্সরাই নয়, বই বিক্রেতারাও স্টল দিতে পারেন। এতে মেলায় অংশগ্রহণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব অপেক্ষা অর্থনৈতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটা অন্যরকম প্রভাব মেলায় পড়েছে। মেলার দর্শক চরিত্র বদলে যাওয়ার ফলে মেলার বই বিক্রির সংখ্যার কী বৃদ্ধি হয়েছে— এটাই মূল প্রশ্ন। কারণ, বইমেলার উদ্দেশ্য দুটি— বইয়ের প্রকাশক ও ক্রেতা-পাঠকের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে মতবিনিময় এবং মানুষকে বই পড়ার উৎসাহ প্রদান করা।

> সামাজিক-মাধ্যম ও বৈদ্যুতিন-মাধ্যম কখনোই বইয়ের পরিপূরক নয়। তবে, সবচেয়ে প্রথমে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দাক্ষিণ্যের মোহ ত্যাগ করে এই সৃষ্টির জগতকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে।

মেলার চাকচিক্য ব্যাপ্তি ও প্রচারের ক্রমবৃদ্ধিতে গিল্ডের প্রয়াস যেমন মান্যতা পায়, তেমনি সরকারি দাক্ষিণ্য ও আনুকূল্য এর একটা বড়ো কারণ। এখানেই বইমেলার সবচেয়ে বড়ো চরিত্রগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। গত ৫০-৬০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমাজ জীবনে রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কাজের

ব্যাপারে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ সুবিদিত। সেজন্য আমাদের কলকাতা বইমেলা যত সরকারি দাক্ষিণ্যের বেড়াজালে নিজেকে সঁপে দিয়েছে ততই সে তার লক্ষ্য থেকে একটু একটু করে সরে গিয়েছে। রাজনীতির মোড়কে বইমেলাকে মুড়ে ফেলার উদ্যোগ রাজ্য সরকারের উচ্চতম স্তর থেকে শুরু হওয়ায় তা রোধ করার ক্ষমতা গিল্ডের ছিল না। গিল্ড সে চেষ্টাও করেনি। আবার বইমেলার ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম বৃদ্ধির ফলে এই মেলা পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল মেলায় পরিণত হলো! এর থেকে লাভের কড়ি সংগ্রহের বিভিন্ন রকম বন্দোবস্ত শুরু হলো— আর তার ফলে বইমেলা তার চরিত্র খুইয়ে এক অদ্ভুত জনসমাগমের মেলায় পরিণত হলো!

এবারের অর্থাৎ ৪৫তম কলকাতা বইমেলায় দু' বছর বাদে পা রেখে যে পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করেছি, তা প্রথমেই বলি। এবার যেন মেলায় বই ছাড়া অন্য জিনিসের প্রাচুর্য! যেমন, ভোজনরসিক বাঙ্গালির জন্য ভারতীয়, চাইনিজ, ও আরও অনেক ফিউশনধর্মী খাবারের দোকান। পুরো মেলার মধ্যে এই দোকানগুলিতেই ক্রেতা ও উপভোক্তার ভিড়। এছাড়া বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রয়াত মানুষজনের নামে মুক্ত ও বদ্ধ মঞ্চ! এগুলির কয়েকটি জায়গায় গিয়ে আমার উপলব্ধি— এগুলিতে ব্যক্তি বিশেষের আত্মপ্রচার ও বিশেষ 'ইজম' ভিত্তিক প্রচার হচ্ছে, যা বইমেলায় বই দেখতে ও পড়তে আসা মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন। এছাড়া, বইমেলায় পটশিল্পী তাঁর পট ও ছবির পসরা সাজিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে বসেছেন! এমনকী জাঙ্ক জুয়েলারি বিক্রির দোকানও দেখেছি! যত মানুষ বই দেখছেন, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি মানুষ, বিশেষত যুবক-যুবতীর দল মোবাইলে সেলফি তুলতে ব্যস্ত। বাবা-মা'র হাত ধরে খুদে পড়ুয়ার দল, যারা বই দেখে, গন্ধ আস্বাদন করে বই কিনত, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। বইমেলায় নয়টি প্রবেশদ্বার থাকায় এবং প্রবেশমূল্য না থাকায় এই মেলায় দর্শক সমাগমের সঠিক হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়।

তবে, একটি ব্যাপার পরিষ্কার— বইমেলা তার দর্শকচরিত্রের বদল ঘটিয়েছে। এখন বই বিক্রেতা তো বটেই, প্রকাশকরা পর্যন্ত বইয়ের সঙ্গে পাঠকের পরিচিত হওয়ার সময় দিতে নারাজ, তাদের হাবভাব অনেকটা ভোগ্যপণ্যের বাজারের মতো— ফেলো কড়ি, মাখো তেল গোছের! তাঁদের কাছে বই বিক্রিই একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। আবার বইমেলার ক্রেতা চরিত্রের আমূল পরিবর্তন নজরে আসে। বইমেলায় ঘুরতে আসা, সেলফি তোলা ও বিভিন্ন খাবারের দোকানে ভিড় করা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পকেটমারও হাজির! এক অভিনেত্রী-কাম পকেটমারও ধরা পড়েছে। আগে বইচোর (এদের চোর বলতে আমার দ্বিধা আছে) ধরা পড়ত— এখন ভোগের সামগ্রীর মেলার চরিত্র অনুযায়ী পকেটমার ধরা পড়ছে! এই সঙ্গে ভালো বই দেখা, কেনা ও পড়ার মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

বিভিন্ন দেশের প্যাভিলিয়নগুলির মধ্যে নজর কাড়ার কথা থিম কান্ট্রি বাংলাদেশের প্যাভেলিয়নের। সেখানে ভিড় আছে। হয়তো তাদের বই বিক্রিও হচ্ছে। এখানে একটা কথা অবশ্যই বলা উচিত— বইমেলা আসলে বইয়ের সঙ্গে পাঠকের পরিচিত হওয়ার মেলা। কারণ, কলেজস্ট্রিটে বই কিনলে বইমেলার থেকে ১০ শতাংশের বেশি ছাড় পাওয়া যায়। কিন্তু কলেজস্ট্রিটে বই বাছার ও বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। সুতরাং, বই চয়ন করার জায়গা হলো বইমেলা। বইমেলার এই রূপটাই এবারের বইমেলায় খুঁজে পাওয়া গেল না। উচ্চমধ্যবিত্তের ড্রইংরুমে সাজানোর জন্য বই কেনা ও সরকারি দাক্ষিণ্যে 'অনুপ্রাণিত' ছোটো-বড়ো, মেজ, সেজ কিছু আধিকারিকের দাপাদাপি দৃশ্যমান! এর মধ্যে পুলিশের দায়িত্ব পালন যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের বইয়ের দাম টাকায় লেখা এবং বাংলাদেশের টাকার আন্তর্জাতিক মূল্যমান ভারতীয় টাকার তুলনায় কম। তবু তারা তাদের দেশের টাকার হিসেবে ভারতীয় টাকায় ১০ শতাংশ ছাড় দিয়ে তাদের বই বিক্রি করছে— অতিরিক্ত মুনাফা লাভের অনৈতিক প্রয়াস। এখানে আরেকটি বিষয় বলা দরকার। এই আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সময় বাংলাদেশের ঢাকার দুটি জায়গায় তাদের সর্ববৃহৎ বইমেলা— 'একুশে বইমেলা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা উদ্বোধন করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে কোনো ভারতীয় প্রকাশক অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানা নেই! এর কারণ বোঝা যায় না— অংশগ্রহণে অসুবিধা কোথায়?

শুধু বাংলাদেশই নয়, আরও কয়েকটি দেশের প্যাভেলিয়নে ঘুরেছি। কিন্তু কোথাও বইয়ের সম্ভার দেখা যায়নি! আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুবিশাল প্যাভেলিয়ন জুড়ে কোনো বইয়ের দেখা পেলাম না। হতে পারে এদের উদ্দেশ্য অন্য! তবে, বইমেলার মূল উদ্দেশ্য, বইপড়ার চেতনাবৃদ্ধির কোনো প্রচেষ্টা এসব জায়গায় দেখা যায়নি। এছাড়া, লিটল ম্যাগাজিন ও ছোটো ছোটো পাবলিশারদের যে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে স্টল দেওয়া এবং সেখানে উৎসাহী পাঠকদের আনাগোনা কয়েক বছর আগেও দেখা যেত, তা এখন সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য।

এবারের বইমেলায় ঘুরে আমার মনে হয়েছে, 'বইমেলা' নামের একটি হুজুগে বিনোদনকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। অবশ্য নবীন ও প্রবীণ লেখকদের বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান মেলা প্রাঙ্গণে হয়ে চলেছে অনেকটা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের মতো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অভাব প্রায় সব ক্ষেত্রেই। এর থেকে কয়েকটি ব্যাপার সহজেই প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, এই সময়ে লেখার ও বিষয়ের গুণাগুণের উপর জনপ্রিয়তা নির্ভর করে না। করে, কোন সংবাদমাধ্যম প্রমোট করছে তার উপর! শুধু প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই নয়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা— সব ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। ফলে গুণমানের অবমূল্যায়নের সঙ্গে বই পড়ার অভ্যাস বাঙ্গালির নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিফলন যে কোনো মুদ্রিত বাংলা সংস্করণের বিক্রির সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়। গল্প-উপন্যাস এমনকী গান, কবিতাতেও স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির বদলে 'ইজম'-এর বহিঃপ্রকাশ--- যা মানুষের সৃজনশীলতাকে গোলাম বানানোর চেষ্টায় পরিণত হচ্ছে। এগুলো পাঠককে গেলানোর চেষ্টার অবিসংবাদী ফল হলো— বাঙ্গালি পাঠক ধীরে ধীরে বই পড়ার অভ্যাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

আবার বিভিন্ন রকম কারণে বইয়ের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এই নেগেটিভ চিন্তাধারায় খানিকটা ইন্ধন জুগিয়েছে। পরিশেষে বলি, বাঙ্গালির মনন, চিন্তনের সুস্থ বহিঃপ্রকাশের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো সৃজনশীল, রাজনীতিমুক্ত চিন্তা, যা লেখার মাধ্যমে আমজনতার কাছে পৌঁছায়। এক সময় এই কৃষ্টি-ঐতিহ্য বাঙ্গালির ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার রাজনীতিমুক্ত চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতার ঐতিহ্য যদি আবার কখনো ফিরে আসে, তাহলে বাঙ্গালি আবার তার বইপ্রীতির জগতে ফিরে আসবে। কারণ, সামাজিক-মাধ্যম ও বৈদ্যুতিন-মাধ্যম কখনোই বইয়ের পরিপূরক নয়। তবে, সবচেয়ে প্রথমে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দাক্ষিণ্যের মোহ ত্যাগ করে এই সৃষ্টির জগৎকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। আমাদের সবার এই দায়িত্ব থাকলেও প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব পাবলিশার্স ও বুকসেলার্স গিল্ডের। ◻

নির্মলার নির্মল বাজেট

শেখর সেনগুপ্ত

কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ যখন তাঁর বাজেট পেশ করছেন, আমি নিবিষ্ট চিত্তে দূরদর্শনের দিকেই চেয়েছিলাম কান খাড়া করে। হাতে নোটবুক ও কলম। তারপর এতগুলি দিন কেটে গেল সেই বাজেটের চরিত্র ও গুণ নির্ণয়ে। এর জন্য আমার আক্ষেপ নেই এই কারণে যে বিষয়টার গুরুত্ব অনেক এবং তার যথাসাধ্য বিশ্লেষণ অবশ্যই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যাঁরা চটজলদি এই কর্মটি কোনও দৈনিক পত্রিকার পাতা ভরাটের তাগিদে করে ফেলেন, বহু ক্ষেত্রে যা যথাযথ হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা আবার হয়ে দাঁড়ায় নিছক লবডঙ্কা। আমি সাংবাদিক নই। তবে অর্থনীতির চর্চা আমার মজ্জাগত। তাই যেন চুপিসারে অনেকটা সময় নিয়ে ফেললাম। বাপকেলে নোটবুক থেকে একটার পর একটা তথ্য, প্রতিশ্রুতি, রূপরেখা টেনে বের করতে থাকি বাজেটের মূল চরিত্রের আভাস পেতে ও দিতে। আমি রাজনৈতিক চক্রের বাইরে ছিলাম, এখনও আছি; কোথায় না কোথায় কে তার দলের হয়ে জুতসই মন্তব্য তৈরি করে ফেলেছে, তা নিয়ে অধমের আদৌ কোনও মাথাব্যথা নেই। আমাকে দাগি বললে প্রকৃত সত্য সেই অভিমতকে ফুৎকারে উড়িয়েও দেবে যথাসময়ে।

দেখুন, নির্মলার বাজেটকে যে কারণে আমি 'নির্মল বাজেট' বলছি, তার অন্যতম উৎস সেই দীপ্ত প্রতিশ্রুতি 'আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ভারতে ৪০০টি 'বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেন' ছুটতে শুরু করবেই। এটা আমাদের শপথ।' অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত সেমি হাইস্পিড এই ট্রেনের আদি রূপকার হলেন চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি'র প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার ড. সুধাংশু মণি।' তিনি টেবিলে কিল মেরে বললেন, 'এতদিনে আমরা এই দেশে এমন এক সরকারকে আনতে পেরেছি, যাঁরা সর্বার্থে আধুনিক ও উন্নয়নমুখী।'

নির্মল বাজেটে এমন কিছু আছে, যা কেবল অর্থনীতির হিসেব কষাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সুনিশ্চিত করতে চাইছে মানবিক সুরক্ষাকেও। উদাহরণ, মাইক্রোচিপযুক্ত সুরক্ষিত ই-পাসপোর্ট চালু করবার দীপ্ত প্রতিশ্রুতি। নির্মলা সীতারামন জানালেন, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ডিজিটাল পাসপোর্ট চালু করতে চলেছেন ভারত সরকার। এই প্রয়াস যেদিন বাস্তবায়িত হবে, সেই দিন আমাদের বাজার-চালু পাশপোর্টের বদলে নিশ্চিন্তে সঙ্গে নিয়ে আমরা ঘুরব অত্যাধুনিক মাইক্রোচিপ বসানো 'ই-পাসপোর্ট'। সেখানে পাসপোর্টধারীর বায়োমেট্রিক তথ্যও রেকর্ডেড থাকবে। এতে কাজকর্ম এখনকার তুলনায় সহজতর হয়ে যাবে বিদেশ মন্ত্রকের।

এই বাজেটের চর্চায় বসে ইকনোমিক সার্ভে বলছে, দেশের জিডিপি ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৮.৫ শতাংশ। আয়কর কাঠামোয় বিত্তমন্ত্রী যে কোনও পরিবর্তন আনলেন না, তা আয়কর দাতাদের নিকট অবশ্যই স্বস্তিদায়ক। অথচ ছিদ্রসন্ধানীরা এই বিষয়ে তাঁদের কোনও বক্তব্য রাখতে না পেরে একটি বিচিত্র বাক্য ছুঁড়ে দিলেন, যা মুখ্যত গোয়েন্দা দপ্তরের কাজ— 'অতিমারীর পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে এই দেশে অনেক ব্যক্তি টাকার পাহাড় তৈরি করে নিয়েছে। বিত্তমন্ত্রীর উচিত ছিল, তা চিহ্নিত করে ভিন্ন আয়কর কাঠামো চালু করা।'

সত্যি, হাস্যকর সুপারিশ!

'মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ' বাজেট প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবেন দেশের সকল অর্থনীতি সচেতন মানুষ। ওই বিস্তৃত প্রকল্পের কল্যাণে আগামী বছরেই নতুন চাকরি তৈরি হবে ৫ লক্ষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেয়েছিলেন কোভিডকালে দেশবাসীর ওপর করের বোঝা যেন না বাড়ে। নির্মলা সীতরামন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শকে মান্যতা দিয়ে এক পয়সাও আয়কর বাড়াননি। এই সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য মধ্যবিত্তের সমর্থন বিজেপি সরকারের প্রতি আরও গাঢ় হয়ে উঠতে পারে, এই ভাবনায় যাঁদের গা শিরশিরিয়ে উঠেছে, তাঁদের প্রধান হলেন রাহুল গান্ধী। তিনি তথ্যের বিশ্লেষণে না গিয়ে শুরু করে দিলেন চিল-চিৎকার, 'এই বাজেট নিয়ে মাতামাতি করবেন না। কারণ, এটা হলো মোদী সরকারের একটি বায়বীয় বাজেট। কারণ, আমি দেখলাম, মধ্যবিত্ত, চাকুরিজীবী, প্রান্তিক জনতা, চাষি, ছোটো ব্যবসায়ী— এদের জন্য কিছুই নেই।'

রাহুল গান্ধীর ইত্যাকার চিৎকার সব বিষয়েই উড়তে উড়তে হারিয়ে যায় দূরদূরান্তরে। গুচ্ছের তথ্যহীন, শূন্য মেধার সমালোচনা নিতান্ত সহজ কাজ। অনেক বলেকয়ে দু' পাঁচজনকে সামনে রেখে যা বলা হবে, পত্রিকার পৃষ্ঠায় তা স্থান পেলেই মহাপ্রাপ্তি। রাহুল গান্ধীর অবস্থা এখন অনেকটাই এই রকম। অনেকের আবার তর

সয় না বিস্তারিত আলোচনায় যাবার। এঁরা জানেন, মধ্যবিত্তের মেজাজ বিগড়ে দিতে পারলেই মোদী সরকারের জনপ্রিয়তার পারদ হু হু করে নামতে থাকবে। তারা তাই সমানে বলে চলেছেন, 'মধ্যবিত্তের জন্য এই বাজেট ডেকে আনবে কেবলমাত্র হাহাশ্বাস'। অথচ এরা ভুলেও টেনে আনেন না সরকারি কর্মীদের পেনশনে করছাড়ের পরিমাণ বৃদ্ধির কথাটা। জাতীয় পেনশন স্কিমে কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্য সরকারেরও কর্মচারীরা অতঃপর ১৪ শতাংশ পর্যন্ত কর ছাড় পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী নিজে বাজেট আলোচনায় অবতীর্ণ হন এবং তাঁর ব্যাখ্যা মন দিয়ে শোনার পর আমার প্রত্যয় জমেছে যে, এই বাজেট পরিকাঠামো উন্নয়নে যতটা জোর দিয়েছে, পূর্ববর্তী কোনও দলের সরকারই তার ধারে কাছে আসবে না। পরিকাঠামোই হবে কর্মসংস্থানের মুখ্য ক্ষেত্র। সেই কারণে এই বাজেট যুগপৎ জনমুখী ও উন্নয়নশীল।

দেশের কৃষকদের সরকারের বিরুদ্ধে যেতে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি যতই উস্কানি দিক, নির্মলা সীতারামনের বাজেটে ভারতের কৃষিজীবীদের উল্লসিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিত্তমন্ত্রী জানালেন, নতুন আর্থিক বছরে কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এস এস পি) অনেকটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশব্যাপী রাসায়নিকমুক্ত চাষের ওপর সরকার জোর দিচ্ছেন। ২০২৩ সালকে 'আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ' রূপে গণ্য করা হবে। তখন মিলেট চাষে সরকার টাকা ঢেলে দেবেন সংশ্লিষ্ট কৃষকদের হাতে। তৈলবীজের উৎপাদন বাড়তেই থাকবে। সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে দেশের চাষিদের হাতে ডিজিটাল এবং হাইটেক টেকনোলজি পৌঁছে দেবার জন্য। এরই অঙ্গ হিসেবে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের ওপর নজরদারি চালাবার জন্য সরকার ব্যবহার করবেন 'কিষাণ ড্রোন।' সেই ড্রোন যেমন রেকর্ড প্রস্তুত করবে, তেমনি নজর রাখবে শস্যের নিরাপত্তার ওপরও। কৃষকদের আয় যাতে দ্বিগুণ হয়, সরকার তার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যাবে। আদতে বাজেট যখন প্রকৃত জনমুখী হয়ে ওঠে, বিরোধীরা আতঙ্কে ততই তার সমালোচনায় সোচ্চার হন, ---এটা আমাদের অনেকদিনের অভিজ্ঞতা। এই বাজেটে নির্মলা জানালেন, মোবাইল বিশেষত 'স্মার্টফোনের দাম অবশ্যই নীচের দিকে টেনে নামাবে। এটা পড়ুয়াদের পক্ষে আনন্দসংবাদ, কারণ এখনকার ছেলে-মেয়েদের কাছে অনলাইন লেখাপড়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৮০ লক্ষ নব বিকাশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এটা নিশ্চয় দেশের যুগপৎ দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের কাছে এক বড়ো সুবার্তা। এবং পানীয় জল। প্রধানমন্ত্রীর শপথ, যা ধ্বনিত হয়েছে নির্মলার নির্মল বাজেটে— দেশের ৩.৮ কোটি বাসস্থানে পাইপের সাহায্যে সরকারই এই সময়সীমার মধ্যে জল পৌঁছে দেবে এবং এর জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হলো ৬০ হাজার কোটি টাকা। মাঝে মধ্যেই গতিহীন হয়ে পড়ত দেশ এবং তার ধকল সামলাতে নাগরিকরা নাজেহাল। নরেন্দ্র মোদী সেই শ্লথগতিকে গতিময় করে তুলতে বাজেটের মাধ্যমে আনলেন তাঁর মাস্টারপ্ল্যান। সাধারণ নাগরিক ও পণ্য পরিবহণে দেশে এসে যাচ্ছে আধুনিকত পরিকাঠামো। গতির বৃদ্ধিসাধনে সংস্কার করা হবে এয়ারপোর্টগুলিকে। বন্দরগুলির বিস্তৃতি ঘটানো হবে এমনভাবে যাতে জলপথে যাতায়াত ও পণ্যসামগ্রী বহনে ঝক্কিঝামেলা অনেকটাই হ্রাস পাবে।

নির্মিত হবে বেশকিছু দীর্ঘ সড়ক। রেলপথের আওতায় আসবে দূরদূরাঞ্চল, গড়ে উঠবে লজিস্টিকস। রাজ্যগুলিও যদি এইসব উন্নয়নে অধিকতর মাত্রা যোগ করতে চায়, কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য বরাদ্দ রেখেছে এক লক্ষ কোটি টাকার ঋণ। যদিও এটা ঋণ, তবু এর জন্য রাজ্যকে দিতে হবে না এক বয়সাও সুদ এবং ঋণ পরিশোধের মেয়াদ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর। ভাবা যায়! চলতি আর্থিক বছরেই সড়কনির্মাণ যার জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ফান্ড গড়া হলো। আগামী অর্থবর্ষে দেশের চারটি স্থানে পিপিপি মডেলে মাল্টিমর্ডান লজিস্টিকস পার্ক গড়ে তোলার বরাত দেওয়ার কথাও বিত্তমন্ত্রী জানালেন।

মেট্রো রেলের প্রসারতাকে প্রশ্রয় দেবার শপথ আমরা শুনতে পেলাম বিত্তমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে। তিনি বললেন, 'আমি জানি, শহরাঞ্চলে লোক গিজগিজ করে। তাই যাতায়াত ব্যবস্থাকে বিস্তৃত এবং অবারিত করতে আমরা দায়বদ্ধ। তবে বেশি তাড়াহুড়ো করলে আবার হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা। তাই মেট্রো ব্যবস্থার নকশা তৈরি করছেন বিশেষজ্ঞরা। বহুলাংশে দুর্গম পার্বত্য এলকায় সড়কের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব বিকল্প পিপিপি মডেলে ন্যাশনাল রোপওয়েজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামকে আমরা বাস্তবায়িত করবো। এই উন্নয়ন কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, উত্তর-পূর্ব ভারতের একটা বড়ো অংশ এবং হিমাচল প্রদেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রায় আনবে নতুন গতি ও মাত্রা। সারা দেশের চিকিৎসকরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত নির্মলা সীতারামনের 'ন্যাশনাল টেলি-মেন্টাল প্রোগ্রাম'-এর জন্য। ভারতবিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জয়রঞ্জন রাম বললেন, 'এই প্রথম একটি কেন্দ্রীয় সরকার মানসিক রোগের চিকিৎসায় নব যুগের সূচনা করলেন।'

রাজকোষে ঘাটতি একটা চিরন্তন ব্যাপার। এই সরকার কিন্তু ঘাটতি নিয়ে হাহাশ্বাস ছাড়ছেন না। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে যাতে জোয়ার আসে, তার জন্য অর্থনীতির পাশাপাশি কূটনীতিও একটা বড়ো ভূমিকা পালন করবে। রুশ-ইউক্রেন লড়াইতে তাই নরেন্দ্র মোদীর মতামত ও ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আশা করছি, ডিজিটাল মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশিকা ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে প্রতারকদের প্রতাপকে একেবারে মুছে দিতে। নির্মলার নির্মল বাজেটকে তাই অকুণ্ঠ কুর্নিশ। □

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

স্বাধীনতা থেকে স্বতন্ত্রতার দিকে : দত্তাত্রেয় হোসবলে

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক এবছর ১১, ১২, ১৩ মার্চ গুজরাটের কর্ণাবতী (আমেদাবাদ)-তে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলেজীর বৌদ্ধিক এবং প্রতিনিধি সভায় গৃহীত প্রস্তাব প্রকাশ করা হলো। —স্ব: স:

ভারত এই বছর স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করছে। এই সময়কালটি শতাব্দী ধরে চলা ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিফলন এবং আমাদের বীর সেনানীর ত্যাগ ও সমর্পণের উজ্জ্বল প্রতীক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হলো এই যে, এইটি কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয়, বরং এটি ছিল রাষ্ট্রজীবনের প্রত্যেক শ্রেণীর তথা সমাজের সমস্ত বর্গের অংশগ্রহণের দ্বারা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় 'স্ব'-কে জাগ্রত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা--- এই রূপে দেখাই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।

এই উপনিবেশবাদী আক্রমণের বাণিজ্যিক লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক-সাম্রাজ্যবাদী তথা ধর্মীয় ভাবে পরাধীন করারও নিশ্চিত উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজরা ভারতীয়দের একতার মূল ভাবনার উপর আঘাত করে মাতৃভূমির সঙ্গে তার ভাবনাত্মক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক দুর্বল করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা আমাদের স্বদেশি অর্থব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিশ্বাস এবং শিক্ষাপদ্ধতির উপর আঘাত করে স্ব-তন্ত্রকে চিরতরে বিনষ্ট করারও প্রয়াস করে।

এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ছিল সমগ্র দেশব্যাপী ও সর্বসমাবেশক। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেশের জনগণ ও জননায়কদের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ প্রতিরোধের জন্য প্রেরণা দান করেন। এই আন্দোলন মহিলা ও জনজাতি সমাজ ছাড়াও কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-সহ রাষ্ট্রজীবনের প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার ভাব জাগ্রত করে। লাল-বাল-পাল, মহাত্মা গান্ধী, বীর সাভারকর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিংহ, বেলু নাচিয়ার, রানি গাইদিনল্যু প্রমুখ জ্ঞাত-অজ্ঞাত স্বাধীনতা সেনানীরা আত্মসম্মান ও রাষ্ট্রভাবের ভাবনাকে আরও প্রবল করেন। প্রখর দেশভক্ত ডাঃ হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে স্বয়ংসেবকেরাও নিজের ভূমিকা পালন করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামান্য কিছু কারণে 'স্ব'-এর প্রেরণা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে, যার ফলস্বরূপ দেশকে বিভাজনের বিভীষিকা সহ্য করতে হয়। স্বাধীনতার পরে এই স্ব-এর ভাবনা রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত করার সুযোগ আমরা পেয়েছি তার

কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা পর্যালোচনা করারও এটা উপযুক্ত সময়।

ভারতীয় সমাজকে এক রাষ্ট্র রূপে সূত্রবদ্ধ রাখতে এবং রাষ্ট্রকে ভবিষ্যতের বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য স্ব-আধারিত জীবনদৃষ্টিকে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির উৎসব আমাদের পূর্ণ সংকল্পবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

এটি সন্তুষ্টির বিষয় যে, প্রচুর প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় প্রগতি করেছে, কিন্তু এটাও সত্য যে, ভারতকে পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্য এখনও অধরা। তথাপি এখন একটি দূরদর্শী ভাবনার সঙ্গে আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্প নিয়ে দেশ এক সঠিক দিশায় অগ্রসর হওয়ার জন্য তৎপর হচ্ছে। এটা আবশ্যিক যে, ছাত্র ও যুবকদের এই মহৎ প্রয়াসে যুক্ত করার মাধ্যমে ভারতকেন্দ্রিক শিক্ষানীতির প্রভাবী ক্রিয়ান্বয়নের দ্বারা ভারতকে এক জ্ঞানসম্পন্ন বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় বা ভারতকে বিশ্বগুরুর ভূমিকা পালনের জন্য সমর্থ করে তোলা যায়। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সময়কালে আমাদের নিজেদের 'স্ব'-এর পুনরায় অনুসন্ধান করার সংকল্প নেওয়া উচিত, যা আমাদের শেকড়ের সঙ্গে জুড়বার এবং রাষ্ট্রীয় একাত্মতার ভাবনাকে পরিপুষ্ট করার সুযোগ করে দেয়।

প্রস্তাব

ভারতকে স্বাবলম্বী করতে কাজের সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, বিপুল মানবশক্তি এবং অন্তর্নিহিত উদ্যমকৌশল থাকায় ভারত নিজস্ব কৃষি, বস্তু নির্মাণ ও সেবা ক্ষেত্রকে পরিবর্তন করে কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ গড়ে তুলে অর্থব্যবস্থাকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। বিগত করোনা মহামারীর কালখণ্ডে আমরা যেখানে রোজগার ও জীবিকার উপর তার প্রভাব অনুভব করেছি, সেখানে আবার অনেক নতুন কাজের সুযোগ বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে; যা থেকে সমাজের কিছুজন লাভান্বিতও হয়েছে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা এই বিষয়ের উপর জোর দিতে চায় যে, রোজগারের এই সমস্যার সফলতাপূর্বক সমাধান করার জন্য সম্পূর্ণ সমাজকেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য নিজের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার মতে এই যে, মানবকেন্দ্রিক, পরিবেশের অনুকূল, শ্রম প্রধান ও বিকেন্দ্রীকরণ এবং লভ্যাংশের ন্যায়সঙ্গত বিতরণকারী ভারতীয় আর্থিক প্রতিমূর্তি (মডেল)-কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যা গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা, ছোটো উদ্যোগ, লঘু উদ্যোগ ও কৃষি ভিত্তিক উদ্যোগকে সংবর্ধন করে। গ্রামীণ রোজগার, অসংগঠিত ক্ষেত্র ও মহিলাদের রোজগার এবং অর্থব্যবস্থাতে তাদের সামগ্রিক অংশগ্রহণের মতো ক্ষেত্রগুলিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন যান্ত্রিক (টেকনিক্যাল) এবং স্বল্প দক্ষদের (সফট স্কিলস) অবশ্যই এগিয়ে আনার প্রয়াস করতে হবে। এটা উল্লেখযোগ্য যে, দেশের প্রত্যেক ভাগে উপরোক্ত দিশায় কর্মসংস্থানের অনেক সফল উদাহরণ রয়েছে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে স্থানীয় বিশেষত্ব, প্রতিভা ও প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রাখা হয়েছে। এমন অনেক স্থানে উদ্যোগপতি, ব্যবসায়ী, স্বল্প পুঁজির কর্মসংস্থান, নিজস্ব সহায়ক গোষ্ঠী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি বর্ধিত-মূল্যের সামগ্রী, স্বয়ংসহায়তা গোষ্ঠী, স্থানীয় সামগ্রীর প্রত্যক্ষ বিক্রয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি (স্কিল ডেভেলপমেন্ট) ইত্যাদি বিষয়ে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছে। এই প্রচেষ্টা হস্তশিল্প, খাদ্য নির্মাণ প্রক্রিয়া, গৃহোদ্যোগ ও পারিবারিক উদ্যোগের মতো ব্যবসাকে উৎসাহ প্রদান করেছে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময়ের মাধ্যমে যেখানে প্রয়োজন সেখানে তার প্রয়োগের বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। কিছু শৈক্ষিক ও ঔদ্যোগিক সংস্থা কর্মসংস্থানের নির্মাণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা দুর্বল এবং বঞ্চিতদের সঙ্গে সমাজের বড়ো অংশকে স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা করাতে সক্ষম এমন সুকৃতির প্রশংসা করে। সমাজে 'স্বদেশি ও স্বাবলম্বন'-এর ভাবনা উৎপন্ন করার ব্যাপারে উপরোক্ত নতুন কর্মক্ষেত্রগুলি উৎসাহিত হবে। উচ্চ রোজগার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু নির্মাণ ক্ষেত্রকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে, যা আমদানির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কম করতে পারে। শিক্ষা ও পরামর্শের দ্বারা সমাজ, বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে শিল্পস্থাপনকে উৎসাহ প্রদানকারী পরিবেশ দিতে হবে, যাতে তারা কেবল চাকরি পাওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এই রকম উদ্যমশীলতার ভাবনাকে মহিলাদের, গ্রামের মানুষদের, দূরবর্তী এবং জনজাতি ক্ষেত্রেও উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাবিদ, উদ্যোগ জগতের প্রমুখ, সামাজিক নেতৃত্ব, সামাজিক সংগঠন ও বিবিধ সংস্থা এই দিশায় প্রভাবী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং তার জন্য সরকারি ও অন্যান্য সহযোগী প্রয়াস এদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা অনুভব করছে যে, তীব্রতার সঙ্গে পরিবর্তনশীল আর্থিক ও প্রযুক্তিগত পরিদৃশ্যের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাদের সামাজিক স্তরে নতুন-নতুন পদ্ধতির সন্ধান করতে হবে। ডিজিটাল অর্থব্যবস্থা এবং রপ্তানির সম্ভাবনা থেকে উৎপন্ন রোজগার ও উদ্যমশীলতার সুযোগের গভীর অন্বেষণ করা প্রয়োজন। রোজগারের পূর্বে ও চলাকালীন মানবশক্তির প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রযুক্তির ব্যবহার, স্টার্ট আপ ও হরিৎ প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদির উৎসাহ প্রদানে আমাদের সহভাগী হতে হবে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে স্থায়ী এবং সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্য প্রাপ্তি করার জন্য নাগরিকদের থেকে কর্মসংস্থানকে ভারতকেন্দ্রিক প্রতিমূর্তির (মডেল) উপর কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সমাজের সমস্ত বর্গকে আহ্বান করেছে যে, বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ বাড়িয়ে আমাদের শাশ্বত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে এক সুস্থ কর্ম-সংস্কৃতি স্থাপন করতে হবে, যাতে ভারত বৈশ্বিক আর্থিক পরিকাঠামোর উপর পুনরায় নিজের উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করতে পারে। ■

আর কত দিন?

গত ১৭ জানুয়ারি স্বস্তিকা পত্রিকায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে শ্রদ্ধেয় শিতাংশু গুহ লিখিত 'নতুন বছরে ধর্ষিতার পোশাক নিয়ে টানাটানি বন্ধ হোক' শীর্ষক পত্রের বিষয়ে এই লেখা। পত্রলেখক বন্ধ হোক বলে কাদের কাছে দাবি করেছেন? 'তারা' বলতে সম্ভবত বাংলাদেশের ক্ষমতায় ঘুরে ফিরে আসা রাজনৈতিক দলগুলোর কথা বোঝাতে চেয়েছেন। শিতাংশু গুহর সঙ্গে আমার কয়েক বছরের মেল আদানপ্রদানের সম্পর্ক। তিনি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, আমি তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে মত বিনিময় করি। তিনি তাঁর এই পত্রে যে নিষ্ঠুরতার কথা লিখেছেন তা তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। অথচ বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া নৃশংসতার ধারাবাহিক বিবরণ তাঁর সম্পাদিত অনলাইন নিউজ লেটার 'ঐক্য' পড়লে চমকে যেতে হবে, সুধী পাঠক চাইলে guhasb@gmail.com এই মেল নাম্বারে মেল করে 'ঐক্য' নিউজলেটার পড়তে পারেন। যাইহোক, যে বিষয়ে পত্রের অবতারণা। শিতাংশুবাবুরা এখনো কি আশা করেন বাংলাদেশের মুসলমানদের একদিন না একদিন শুভ বুদ্ধির উদয় হবে? বাংলাদেশের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান তো কালাপাহাড়। কোরানের সুরা তওবা আয়াত ৫-এ (কুরান শরিফ থেকে অনুবাদ করেছেন গিরিশচন্দ্র সেন) বলা হয়েছে, অন্তর যখন হজক্রিয়ার মাস সকল অতীত হবে তখন যে স্থানে অংশীবাদীদিগকে প্রাপ্ত হও, সেই স্থানেই তাহাদিগকে সংহার করিয়ো...। এখানে অংশীবাদী কথাটির অর্থ অমুসলমান। এই আয়াতকে হাতিয়ার করে নানা ভাবে নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে অমুসলমানদের দেশ ছাড়া তারা করবেই এবং যত সত্বর সম্ভব। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শতকরা ১০ ভাগ মুসলমান নিজেরাই দেশ ত্যাগ করছে বা ত্যাগের মন্তব্য করছে। সেক্ষেত্রে শিতাংশুবাবুরা এখনো আশায় আছেন মাতৃভূমিতেই থাকবেন। তাই যদি চান তবে বাংলাদেশের দশটা জেলা নিয়ে একটা স্বাধীন 'বঙ্গভূমি' রাষ্ট্রের দাবি তুলুন এবং জন বিনিময়ের মাধ্যমে মীমাংসায় আসুন। রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণার্থী সংক্রান্ত ১৫-এ ধারায় এ দাবি তোলা যায়। হিন্দু নির্যাতনের পাঁচ ভাগ মামলারও নিষ্পত্তি হয়নি। আর এক ভয়ংকর আইন চালু করেছে সে দেশের সরকার। 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন।' এই আইন বলে হিন্দুদের ইসলাম অবমাননার দায়ে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হচ্ছে। ইসলাম এতই ঠুনকো যে সামান্যতম কারণে তার অবমাননা হয়। সেই রেগে যাওয়া লোকটার মতো, তাকে 'আয় তুতু' বললে রেগে যায়, তাই তাকে দেখতে পেলেই ওই কথা বলে রাগায় আর সে গালমন্দ করে। বর্তমানে কর্ণাটকে হিজাব নিয়ে এক বিতর্ক সারা উপমহাদেশে তুমুল শোরগোল তুলেছে। যদিও ওই রাজ্যের সরকার শুধু স্কুল পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম বাধ্যতামূলক বলেছে, আর কারো ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু সুযোগ কে ছাড়ে— সারা বাংলাদেশ জুড়ে এর প্রতিবাদ স্বরূপ সে দেশে হিন্দু মেয়েদের শাঁখা সিন্দুরের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। গোটা দেশ জুড়ে মোল্লারা পথে নেমেছে। তাতে কে শামিল হয়নি— আওয়ামি লিগের এক উপজেলা প্রেসিডেন্ট মাইক হাতে কয়েক শত অনুগামী-সহ হিন্দু পাড়ায় পাড়ায় ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনো দলই হিন্দুদের কাছে নিরাপদ নয়— এ এক শাঁখের করাত।

জন্মভূমির মায়ায় আর কতদিন পড়ে থাকা যাবে। পালিয়ে এদেশে এসেও কোনো লাভ নেই হিন্দুদের। নির্যাতিত হয়ে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও খ্রিস্টানদের জন্য সিএএ চালু করতে গেলে এ দেশের মুসলমান তোয়াজী রাজনৈতিক দলগুলো প্রবল বাধা দেবে এমনকী মরিচঝাঁপির মতো গুলি খেয়ে মরতে হতে পারে। সুতরাং মানবতার স্বার্থে রাষ্ট্রপুঞ্জে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তুলতে হবে নচেৎ পাশের দেশে ভারতে গিয়ে (যা ৭৫ বছর আগে তাদের ছিল) অন্য ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হবে। তাই এই অনিশ্চিত জীবন নিয়ে আর কত দিন।

—**বিমল কুমার চক্রবর্তী,**
উত্তর মানশ্রী, হাওড়া।

হিজাব নিয়ে বিতর্ক নয়, হিজাব পরে কলেজে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক

হিজাব নিয়ে বিতর্ক নয়, হিজাব পরে কলেজে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক। মুসলমান মৌলবাদীরা মেয়েদের বোরখা পরে কলেজে যওয়ার পক্ষে কারণ মেয়েদের বোরখা, হিজাব, নাকাব পরা নাকি তাদের ধর্মীয় বিধান। মুসলমান মেয়েদের দেহের কোনোও অংশ উন্মুক্ত দেখলে মুসলমান পুরুষদের সেক্স জাগে। পুরুষদের সেক্স রোধ করার জন্য মেয়েদেরকে পদদলিত করে রাখার জন্যে, আরও কত সব রীতিনীতি আছে যারা মেনে চলেন তারা বলতে পারবেন। নারীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার সুপ্ত বাসনা পুরুষরা কখনো ত্যাগ করতে পারে না। যদি নারীর উন্মুক্ত দেহ দেখে পুরুষের সেক্স জাগে, পুরুষদের বোরখা, হিজাব, নাকাব পরা আবশ্যিক। কিন্তু হচ্ছে উলটো। আজকাল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মহিলারা ওই ধর্মীয় পোশাক প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বোরখা বর্জন করে তারা দেহ, মাথা, চোখ খুলে রাখতে চান। হিজাব পরে মাথার সুন্দর, সোনালি চুল তারা ঢাকতে চান না। নাকাব খুলে চোখে চোখ রাখতে তাদের ভালো লাগারই কথা। এই ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে বের হয়ে জগদ্দল পাথরের মতো মধ্যযুগীয় বর্বর ধর্মীয় প্রথার অভিশাপ থেকে তারা মুক্তি খোঁজে। কিন্তু মৌলবাদীদের সঙ্গে বর্ষার কুনো ব্যাঙের মতো গলা ফুলিয়ে চিৎকার করে নেতা, নেত্রী-সহ সিনেমা জগতের কিছু মহিলা তারকারা। শাবানা আজমি, স্বরা ভাস্করদের মতে বোরখা পরা ধর্মীয় স্বাধীনতা, এতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যদিও তারা নিজেরা অর্ধ নগ্ন (উলঙ্গও বলা যায়) হয়ে থাকতে সাবলীল বলে মনে করেন। তখন তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের অনুশোচনা থাকার কথা নয়। বোরখা পরার

ফঃ ৩

পক্ষ নিয়ে তারা বিতর্ক দীর্ঘায়িত করে চলেন। কিন্তু বিতর্কে জল ঢেলে দিয়েছে কর্ণাটক হাইকোর্টের আদেশ। কোনো সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মীয় পোশাক পরা যাবে না। প্রসঙ্গত জানা দরকার ১৯৫২ সালে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্কুল, কলেজ-সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম পোশাক বিধি চালু করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে মুশকিল হচ্ছে মুসকান জয়নাবকে নিয়ে, যে এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। সে কর্ণাটকের ওই কলেজে (মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল কলেজ) কখনো হিজাব পরে যেত না। কয়েকটা রাজ্যের নির্বাচনের মুখে সে হিজাব পরে কলেজে গিয়ে আগুনে ঘি ঢেলেছে। তার হঠাৎ হিজাব পরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্যে নয়, তার ওই হিজাব রাজনৈতিক হাতিয়ার বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীরাম ধ্বনির বিরুদ্ধে আল্লাহ হু আকবর বলে তার সুতীব্র চিৎকার শুনেছি। তার এই বিদ্রোহী মনোভাব ভালো লেগেছে। যদি তার এই বিদ্রোহ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হতো খুব ভালো লাগত। যদি বোরখা, হিজাব, নাকাবের বিরুদ্ধে হতো সত্যিই তার সাহসিকতার প্রশংসা করতেই হয়।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

শাসক ও বিরোধী উভয়কেই ইতিবাচক রাজনীতি করতে হবে

রাজনীতি মানে যা কিছু, যেমন কিছু বলার দিন শেষ। রাজনীতি করতে এসে এমন সমালোচনা করা যাবে না যাতে দেশের সম্মান নষ্ট হয়। বিশ্বের মানুষ যাকে মাথায় রাখে তাকে ছোটো করতে করতে তারাই ক্ষুদ্র হয়ে গেল। এই রাজ্যের মানুষ তো দেখছে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু কিছু কাজের প্রশংসা করে। তারা তো তাদের প্রতিপক্ষের প্রশংসা না করলেও পারতেন। তা তো করেননি। তাই মানুষ ভোটের বাক্সে তাদের ডিভিডেন্ট দিয়েছে। শাসক ও বিরোধী সবাইকে এবার থেকে ইতিবাচক রাজনীতি করতে হবে। আজ ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে মানুষের কাছে সব খবর পৌঁছে যাচ্ছে। লখিমপুর ও খেরি নিয়ে কত বাড়াবাড়ি হলো। ভুল তো হয়েছিল। তাতে রং চড়িয়ে যারা ভেবেছিল মোদী-যোগীকে জব্দ করা যাবে, তারাই জব্দ হয়ে গেল। কৃষি বিলের শুধু ত্রুটিগুলো রাহুল গান্ধী সংসদে তুলতে পারতেন। তিনি তা না করে ট্রাক্টর চড়ে ড্রামাবাজী করলেন। কী লাভ হলো? তিনিই তো প্লেটে করে পঞ্জাবকে আপের হাতে তুলে দিলেন। বিজেপি জানে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প হয় না। বিজেপি তাদের কর্মীদের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে পেরেছে।

—**শ্যামল হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

জম্মু ও কাশ্মীরে রোশনি অ্যাক্ট বাতিল

১৯৯০ দশকে কাশ্মীরে কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতদের ওপর স্থানীয় মুসলমানদের অবর্ণনীয় অত্যাচার নির্যাতন হিন্দুকন্যা অপহরণ, ধর্ষণ, বলপূর্বক নিকাহ করা বা অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ার সংবাদ আমরা মাঝে মধ্যে কিছু কিছু পেতাম। কিন্তু স্বামীকে হত্যা করে তার রক্তে ভাত মেয়ে স্ত্রীকে খেতে বাধ্য করা বা তরুণী কন্যাকে পিতা-মাতার সামনেই বিবস্ত্রা করে ধর্ষণ করার সংবাদ কটাই বা পেতাম? গণধর্ষণ, গণহত্যা ও লক্ষ লক্ষ মানুষের বাড়িঘর জ্বালিয়ে তাদের ভিটেমাটি ছাড়ার করুণ কাহিনি কটাই সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু কয়েক লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিত এখনও কাশ্মীরে নিজেদের ভিটেতে ফিরে যেতে পারছেন না। কিন্তু কেন? প্রশ্নটা এখানেই। কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা মুফতি মহম্মদ, সৈয়দ গুলাম নবি আজাদ-সহ অন্যান্য সরকারি আমলারা কাশ্মীরে 'রোশনি অ্যাক্ট' নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছিলেন, যে আইনের ফলে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা নিজেদের বাড়িঘর, আপেল বাগান, কারখানা প্রভৃতি ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন, সে সমস্ত বাড়িঘর জমি, কারখানার কর আদায় হচ্ছিল না। সরকারের কর বাবদ অর্থ আদায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে কারণে কাশ্মীর সরকার 'রোশনি আইন' চালু করে ওই সমস্ত ফাঁকা বাড়িঘর, জমি, কারখানা নামমাত্র মূল্যে স্থানীয় মুসলমানদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছিল। জমি, বাড়ি, কারখানা, আপেল বাগান প্রভৃতির প্রকৃত স্বত্ত্বাধিকারীদের অজ্ঞাতসারে। কোনও সরকারের পক্ষে এ ধরনের কাজ বেআইনি নয় কি? এইসব বেআইনি কাজকর্ম করার সাহস কাশ্মীর সরকারের হয় কী করে? উত্তরটা জানা প্রয়োজন অবশ্যই।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার,
চন্দননগর।

জাভা দ্বীপনামের উৎস সন্ধানে

ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছে দেশ ইন্দোনেশিয়া। এই দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বহু প্রাচীন। বলতে গেলে, ভারতের একটি সাংস্কৃতিক রূপ ইন্দোনেশিয়া। দেশে ছোটো-বড়ো দ্বীপের সংখ্যা ১৩ হাজার ৬৭৭। অন্যতম বড়ো দ্বীপের নাম জাভা। সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার প্রায় অর্ধেক লোক এই দ্বীপে বসবাস করে। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা জাভা দ্বীপেই অবস্থিত। ১৮৮৩ সালে জাভা ও সুমাত্রার মাঝে সুপ্ত থাকার পর হঠাৎ একদিন আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে প্রায় ৩৬ হাজার মানুষ মারা যায়। ইন্দোনেশিয়া তথা জাভা দ্বীপ হচ্ছে আগ্নেয়গিরির দেশ। আগ্নেয়গিরি থেকে যে অগ্নি-উদ্‌গীরণ ঘটে তাকে সংস্কৃতে 'জ্বালা' বলে। ইংরেজি বানানে Jawala বা Java হয়। বাংলায় V-এর প্রতিবর্ণ হচ্ছে 'ভ'। তাই জাভালা বা জাভা হয়ে যায়। পরিশেষে বলতে হয়, জ্বালামুখীর দ্বীপের নামই জাভা দ্বীপ। বলা বাহুল্য, ভারতীয়দের প্রথম পরিচয় জাভা দ্বীপের সঙ্গে ঘটেছিল।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ।

সন্তানকে সবদিক থেকেই উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব মা-বাবার

তমাল চৌধুরী

সমাজে আমরা নিজেরাই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকি। রান্না করা ও ঘর গোছানোর মতো মূল বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও শিশুদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির পরিবেশই এর জন্য দায়ী। অনেক সময় ছোটোবেলা থেকেই একটা পার্থক্য তৈরি করা হয়। মেয়েদের এই কাজগুলি করা উচিত বা উচিত নয় অথবা এই এই বিধিনিষেধগুলি মেনে চলা প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী সমাজের রীতিনীতিও চলতে থাকে। পরে একটা সময় মানুষ সেগুলিকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলে।

বর্তমানে সমাজ পালটেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সেই পুরনো ধ্যানধারণাকে নিজের গভীরেই প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। সমাজের কিছু ভালো জিনিসের সঙ্গে আমরা এমন কিছু কিছু ঘটনার সাক্ষী থাকছি যা কোনো সভ্য সমাজে কাম্য হতে পারে না। তাই ছোটো থেকেই একটি ছেলে বা মেয়েকে শেখাতে হবে সে কীভাবে নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে।

অনেকেই ভুল ধারণা করে থাকেন যে, শুধুমাত্র মেয়েদেরই যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। ইদানীং আমরা প্রতিদিনই কিছু খবর শুনতে পাই, যার থেকে নানারকমভাবে অভিভাবকরা চিন্তিত থাকেন। তাই মেয়েদের মতো ছেলেদেরও 'ভালো স্পর্শ' ও 'খারাপ স্পর্শ'-এর মধ্যে পার্থক্য করতে শেখানো উচিত। বাড়িতে অভিভাবকরা বেশিরভাগ সময় বলে থাকেন, ছেলেদের কাঁদতে হয় না। কিন্তু একটি মেয়ের মতো একটি ছেলেরও তো অনুভূতি থাকে। তাই তার কোনো কষ্ট হলে সে কাঁদবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেদের সাধারণত বোঝানো হয় কান্নাকাটি বা আবেগ প্রকাশ করো ঠিক আছে, কিন্তু এটা পুরুষোচিত নয়। ছেলেদের আবেগ চেপে রাখতে হয়, কারণ তাদের বিশ্বাস করানো হয় যে আবেগ শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য। এই ধারণা থেকে ছেলেদের বের করে নিয়ে আসতে হবে। কারণ মানুষ মাত্রেই রাগ, দুঃখ অভিমান থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর সেটিকে প্রকাশ করার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই।

অনেক সময় বাড়ির কন্যাসন্তানকে ঘর ঘোছানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শেখানো হয়।। ছেলেদের এই সমস্ত কাজ থেকে দূরে রাখা হয়। ছেলে হোক কিংবা মেয়ে, তাদের সঠিকভাবে তৈরি করতে হলে পড়াশোনার পাশাপাশি সবকিছু শেখানোর প্রয়োজন আছে। তবেই সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ কোনো রকেট বিজ্ঞান নয় এবং এটির জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে আমরা মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও উৎসাহিত করতে পারি। তাহলে পরবর্তী জীবনে কোনো একটি ছেলের নিজের বাড়ি থেকে কর্মস্থল আলাদা হলে তার কোনো সমস্যা তৈরি হবে না। কারণ সে ততদিনে সব কাজে সাবলীল হয়ে উঠবে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য খাদ্য একটি মৌলিক প্রয়োজন। তাই ছেলেদেরও রান্না শেখায় কোনো দোষ নেই। এক্ষেত্রে বাবা-মায়েদের তার মেয়ের মতো ছেলেকেও অল্প বয়স থেকেই রান্নাঘরের কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। ছোটো থেকেই একটি সন্তান যখন পরিবারের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠছে, তখন আর পাঁচটি সহবত শেখানোর পাশাপাশি ছেলে ও মেয়ে যে সমান তার ধারণা দেওয়া উচিত। তাদের মধ্যে কোনো রকমের পার্থক্যকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এতে একটি শিশুকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। বাড়িতে দুটি ভাই বা বোনের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য করা হলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পরবর্তীকালে একসঙ্গে বেড়ে ওঠা সেই ভাই-বোনের মধ্যে মানসিকতার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই শৈশব থেকেই শিশুকে শেখানো উচিত ছেলে বা মেয়ে বলে আলাদা কোনো কাজ হয় না। দুজনেরই সব কাজ করা উচিত। অনেক সময় একটি মাত্র সন্তান হলে তার প্রতি মা-বাবার আবেগ একটু বেশি তৈরি হয়। এটাও কিন্তু সন্তানের ক্ষতি করতে পারে। মা-বাবা তার সন্তানকে ভালোবাসবেন সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু অতিরিক্ত আবেগ সন্তানের জন্য ঠিক নয়। তাই সন্তান একটা হোক বা দুটো, ছেলে হোক বা মেয়ে, তাকে সঠিকভাবে বড়ো করে তুলতে হলে যেমন পড়াশোনা শেখানো উচিত, তেমনই সঠিক আচার ব্যবহারও শেখানো প্রয়োজন। সঙ্গে ঘরের কাজকর্ম। অন্তত ভবিষ্যতে সে যাতে কোনো কিছুর জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়। ▫

অতিরিক্ত ব্যায়াম ক্ষতি করতে পারে হৃৎপিণ্ডের

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ভালো ও সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়াম করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যায়াম হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি করে দিতে পারে। আমরা অনেকেই মনে মনে ভাবি যে কীভাবে সুস্থভাবে জীবনযাপন করা যায়। সেজন্য আমাদের প্রতিদিন ব্যায়াম করা অভ্যাস করতে হবে। আমাদের নিয়ম করে প্রতিদিন অনেকটা দৌড়াতে হবে, ইত্যাদি। তবে এই মুহূর্তে আমাদের সকলেরই হয়তো আশ্চর্য লাগবে এটা জানতে পারলে যে এই সমস্ত পরিশ্রমসাধ্য ব্যায়াম করে আমরা স্বাস্থ্যের উন্নতি করার চাইতে এই দেহযন্ত্রটির ক্ষতিই করে চলেছি। উল্লেখ্য, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি শরীরচর্চা করা সত্ত্বেও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

নতুন এক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা জানাচ্ছে যে, এই ধরনের পরিশ্রমসাধ্য ব্যায়াম করলে স্বাস্থ্যের উন্নতিও হতে পারে, আবার অবনতিও হতে পারে। সেজন্য আমাদের ব্যায়াম সাবধানে করতে হবে। দেখা গেছে, খেলোয়াড়দের এমন ব্যায়াম করে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা সম্ভব। তবে অনেকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

শারীরিক অনুশীলন বা ব্যায়াম সাধারণত হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের জন্য খুব জরুরি। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে, যাঁরা প্রতিদিন একটু-আধটুও ব্যায়াম করতে অভ্যস্ত তাঁদের হৃৎযন্ত্রের অসুস্থতায় মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম, বিশেষ করে তাঁদের তুলনায় যাঁরা সাধারণত শুয়ে-বসে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। তবে এই সমস্ত সমীক্ষার ফলাফল আবার অন্যরকম কথাও বলছে যা আমাদের রীতিমতো অশান্তিতে ফেলে দিতে পারে। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা গেছে, খুব বেশি ব্যায়াম করলে হৃৎযন্ত্রের স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে এই ধারণাটা ঠিক নয়। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যায়াম করলেই আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের উপকার হবে, কিন্তু তার অধিক ব্যায়াম করলেই বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ড. পল থম্পসনস কানেকটিকাটের হার্টফোর্ট হসপিটালের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি, তাঁর সহকর্মীরা এবং নেদারল্যান্ডসের র‍্যাডবৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের বিজ্ঞানীরা একযোগে হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এই ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন এবং গবেষণাকার্যে নিযুক্ত আছেন। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঘেঁটে ড. থম্পসনস আমাদের জানাচ্ছেন, এই ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে একটা বিশেষ পর্যায় পার করে ব্যায়াম করলে সেটা একজন সুস্থ, সবল ও স্বাস্থ্যবান মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে আমাদের জেনে রাখা দরকার, আমরা যাঁরা সবসময় অনেকটা শরীরচর্চা করতে পছন্দ করি তাঁদের হৃৎপিণ্ডের ফিজিওলজি এবং আকারের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়।

সংক্ষেপে বলতে হয়, অনেকটা শারীরিক শ্রম এবং তার ফলে ঘটে যাওয়া হৃৎপিণ্ডের এই পরিবর্তনসমূহ হৃৎপিণ্ডের গায়ের কোষগুলিতে ছিদ্র সৃষ্টি করে। এর ফলে রক্তপ্রবাহের মধ্যে প্রোটিন চলে আসে। সেটা অন্য পরিস্থিতিতে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সূচনা করে।

ড. থম্পসনস জানাচ্ছেন, এই প্রোটিন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায় এবং হৃৎপিণ্ড সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু ঘটনা আবার অন্যরকমও হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে যাঁদের দেখলে সুস্থ বলে মনে হয়, তাঁদের জন্য কিন্তু অতিরিক্ত ব্যায়াম করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বয়স্ক দৌড়বিদরাও কিন্তু অলস ব্যক্তিদের মতোই সমানভাবে বিপদে পড়তে পারেন। কারণ তাঁদের ধমনিতে প্লাকস সৃষ্টি হতে পারে। আবার তাঁরা ব্যায়াম করলে প্লাকস কিন্তু ভেঙেও যেতে পারে। তাঁদের হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। নতুন সমীক্ষাতে আরও জানা গেছে, যাঁদের হৃদ্‌যন্ত্রে জন্মগতভাবেই কার্ডিয়োমায়োপ্যাথির সমস্যা আছে, তাঁরা অতিরিক্ত পরিশ্রমসাধ্য ব্যায়াম করলে হৃদ্‌যন্ত্রকে আরও উত্তেজিত করে তুলতে পারেন। □

রাজনীতির গুমঘর থেকে ইতিহাসের মুক্তি

শিশুর সামনে মায়ের মাথায় বন্দুক ধরে শ্লীলতাহানি ও খুন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাড়ি থেকে বার করে এনে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে হত্যা। এমনকী শিশুর মাথার খুলি উড়ে যায় গুলিতে। দর্শক আসনে বসে শিহরিত হতে হয়। মনে হয়, হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান আর্মি কাশ্মীরে যদি সন্ত্রাসবাদীদের এনকাউন্টার করে, তবে ঠিকই করে।

হীরক কর

'যারা সত্যকে তুলে ধরেছেন তাদের কথা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য একটা ইকোসিস্টেম কাজ করছে। ছবিটির তত্ত্বগত দিক যাচাই করার পরিবর্তে ওই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হলো ছবিটিকে ভ্রান্ত বলে দাগিয়ে দেওয়া।' যারা এই ধরনের 'সত্য' প্রকাশ করছেন তাদের হয়ে দলীয় নেতৃত্বকে এগিয়ে আসার কথা বলেন তিনি। তিনি আর কেউ নন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। সম্প্রতি বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী মার্চের ১১ তারিখে মুক্তি পাওয়া একটি হিন্দি ছবির কথা বারে বারে বলেন। চার রাজ্যে দলের সাফল্য নিয়ে বলার চেয়ে মোদী অনেক বেশি জোর দেন 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নামের বলিউডি ছবিটি নিয়ে আলোচনায়। এই ছবিতে কাশ্মীরে পণ্ডিতদের উপত্যকা ছেড়ে পালানোর ঘটনা তুলে ধরেছেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী।

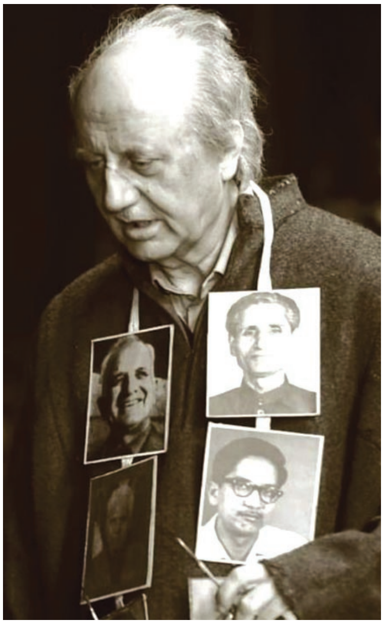

একটি দৃশ্যে অনুপম খের

নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'সত্য সামনে আশায় তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বাক্স্বাধীনতার পক্ষের সরকারি ঝান্ডাধারীরা কেঁপে গিয়েছেন। যারা সত্য তুলে ধরতে চায় তাদের বদনাম করে এই ছবিটিকে আটকানোর জন্য একটা গোটা ইকোসিস্টেম সক্রিয় রয়েছে। আসলে বাক্স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করা লোকেরা নিজেরা যা সত্য বলে মনে করেন, সেটাকেই তুলে ধরতে চান। ওই গোষ্ঠী গত কয়েকদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে প্রকৃত সত্য ঘটনা সামনে না আসে। এদের সমস্যা হলো, যে সত্য ঘটনা এতদিন লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, এখন তা তথ্যনির্ভর হয়ে দেশের মানুষের সামনে এসে পড়েছে। ইতিহাসকে সময় সময় সমাজের সামনে ঠিক ভাবে উপস্থিত করতে হয়। এতে সাহিত্যের যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনই সেই দায়িত্ব নিতে পারে সিনেমাও। তাই এই ধরনের 'সত্য প্রকাশ' যারা করেন তাদের পক্ষ নেওয়া উচিত।

'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর ঘটনার সূত্রপাত ১৯ জানুয়ারি, ১৯৯০ সালে। ফ্ল্যাশব্যাকে কখনও উঠে এসেছে ১৯৮৯-এর কাশ্মীর। কখনো ২০১৬ সালে দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে বামপন্থী ছাত্রদের 'আজাদি' স্লোগানকে কেন্দ্র করে আন্দোলন। আবার বর্তমান পরিস্থিতি।

কাশ্মীর থেকে হিন্দুদের তাড়ানোর জন্য কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ইসলামিক জঙ্গিরা খুন করছে। হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ করছে। আর তা আটকানোর চেষ্টা করছেন তৎকালীন শ্রীনগরের ডিভিশনাল কমিশনার আইএএস ব্রহ্ম দত্ত (মিঠুন চক্রবর্তী)। ব্রহ্ম দত্তের শরণাপন্ন হচ্ছেন অনেক হিন্দু পরিবার। তাই, তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ লোকেদের ফোনও করেন। কিন্তু না, নারকীয় হত্যালীলা চলতেই থাকে। পুলিশের তৎকালীন ডিজি (পুনিত ইশার) এবং ব্রহ্ম দত্ত পুলিশকে নির্দেশ দিলে তারা হত্যালীলা রোখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। ডিজির মুখের ওপর পুলিশকর্মীরা জানিয়ে দেয়, তিনি যেমন হত্যালীলা

আটকানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনি উগ্রপন্থীদের কমান্ডার তাদের নির্দেশ দিয়েছিল তারা যেন এলাকার আশেপাশে না থাকে। ফলে, পুলিশকর্মীরা কার কথা শুনবেন? প্রাণ বাঁচাতে তারা এলাকা ছেড়ে ছিলেন।

জঙ্গি গোষ্ঠীর এক নেতাকে গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী। সে একাধিক খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। মৃতরা সকলেই হিন্দু কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারের। হত্যালীলার এই মাস্টার মাইন্ডের সাক্ষাৎকার নেন সরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক বিষ্ণুরাম (অতুল

মিঠুন চক্রবর্তী

শ্রীবাস্তব)। জঙ্গি নেতাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কতজনকে হত্যা করেছেন আপনি? ঠাণ্ডা গলায়, ভাবলেশহীন মুখে, ওই জঙ্গি বলে ২০, ২৫ও হতে পারে। গলায় অনুশোচনার লেশমাত্র নেই। হতবাক বনে যান সাংবাদিক। উগ্রপন্থীকে বলেন, আপনি যে সংগঠনের হয়ে কাজ করেন তাঁরা যদি আপনার ভাইকে খুন করতে বলতো বা আপনার মাকে? তাহলে আপনি কী করতেন? এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে সে বলে ওঠে, 'কী আবার করতাম। মেরে দিতাম।'

এরই মধ্যে কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের খুনের ঘটনা, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো চলতেই থাকে। তারই মধ্যে ৩৭০ ধারা বিলোপের জন্য

পল্লবী যোশী

কাশ্মীরি পণ্ডিতরা দাবি জানাতে থাকেন। তাদেরই একজন দীর্ঘদিন কাশ্মীরে বসবাসকারী পুষ্কর নাথ পণ্ডিত। অভিনয় করেছেন অনুপম খের। বাস্তব জীবনে অনুপম নিজেও কাশ্মীরি পণ্ডিত। পণ্ডিতদের কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনার জন্য বহুদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন অনুপম। ব্যক্তিগত জীবনে এ বিষয়ে একজন প্রতিবাদী এবং বহু প্রবন্ধের লেখক।

পুষ্কর পণ্ডিতের পরিবারের কাহিনি এই ছবির মূল প্রতিপাদ্য। এই সমস্যার মধ্যে তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, কী করবেন? জন্মস্থানে থাকবেন, নাকি প্রাণ বাঁচাতে ভারতের অন্য কোনো প্রান্তে পালিয়ে যাবেন? এমত অবস্থায় ছেলেকে 'ভারতের গুপ্তচর' বলে অভিহিত করে সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে। এবং নৃশংস ভাবে উপর্যুপরি গুলি চালিয়ে হত্যা করে। বন্দুকের নলের মুখে উগ্রপন্থীরা ছেলের রক্ত চালের সঙ্গে মেখে পুত্রবধূকে খেতে বাধ্য করে। বিনিময়ে দুই নাতি, পুত্রবধূ এবং পুষ্কর প্রাণ ফিরে পান। সেই দিনটাই ১৯ জানুয়ারি, ১৯৯০। শরণার্থী শিবিরে স্থান হয় তাঁদের।

দর্শন কুমার

এরপর তিরিশ বছর গড়িয়ে যায়। পুষ্করের ছোটো নাতি কৃষ্ণা পণ্ডিত (দর্শন কুমার) কালচক্রে দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। সেখানে ছাত্র সংসদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ায়। তাকে ভুল পথে চালনা করে এক অধ্যাপিকা। রাধিকা মেনন (পল্লবী যোশী)। রাধিকা কাশ্মীর নিয়ে রাজনীতি করে। সাধারণ ছাত্রদের ভুল বোঝায়।

ইতিহাসের দোহাই দিয়ে নিরীহ লোকদের বলে, কাশ্মীর কোনোদিনই ভারতের ছিল না। তাই, তাদের অবিলম্বে মুক্ত হওয়া উচিত। দল বেঁধে তারা স্লোগান তোলে, 'আজাদি', 'আজাদি'।

এক সময় বিষয়টি জানতে পারেন পুষ্কর। খেপে যান। নাতিকে বলেন, তুই কী জানিস কাশ্মীরের ব্যাপারে। কাশ্মীরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিব, পঞ্চতন্ত্র। রাজনীতি মানেই বিনাশ। 'আজাদি' আসলে সন্ত্রাসবাদীদের জন্য গাওয়া গান।

কৃষ্ণা পণ্ডিতকে ঠিক বিপরীত কথা বোঝায় রাধিকা। বলে, 'আজাদি' আসলে কাশ্মীর মুক্তির সংগীত। দোটানায় পড়ে যায় কৃষ্ণা। একদিন গভীর অসুখে পুষ্কর মারা যান। মৃত্যুর আগে নাতিকে বলে যান, তাঁর চিতাভস্ম যেন কাশ্মীরে তাঁদের ফেলে আসা বাড়িতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই, কৃষ্ণা ঠাকুরদার চিতাভস্ম নিয়ে শ্রীনগরে আসে। ওঠে রিটায়ার্ড ডিভিশনাল কমিশনার ব্রহ্ম দত্তর বাড়িতে। সেখানেই দেখা হয়ে যায় এক সময় পুষ্করের বন্ধু ডাক্তার প্রকাশ, সাংবাদিক বিষ্ণু রাম এবং ডিজিপি-র সঙ্গে। গল্পে গল্পে কাহিনি এসে পড়ে ১৯৯০ থেকে ২০২০-তে।

যুবক বয়সে ঠিক-ভুলের সঠিক হিসাব থাকে না। আবেগ তাড়িত হয়ে ভেসে যায় মন। কিন্তু সময় গড়াতে গড়াতে ভুল ভাঙে। অনেক মানুষের মুখোশ খুলে বেরিয়ে পড়ে আসল কদর্য মুখ। তখন শুধুই আফশোস। শেষ পর্যন্ত যা ঘটে কৃষ্ণার জীবনে। একদিন শ্রীনগরে আবিষ্কার করে যার কথায় সে 'আজাদি' স্লোগানে ভেসে গেছিল, সেই রাধিকা আসলে সন্ত্রাসবাদীদের মাস্টার-মাইন্ডের প্রেমিকা। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আগের দিন শেষ সমাবেশে কাশ্মীরের 'আসল সত্য' প্রকাশ করে দেন কৃষ্ণা পণ্ডিতের চরিত্রে দর্শন কুমার। তার পনেরো মিনিটেরও বেশি সময় ধরে একটানা ডায়লগে তিনি তুলে ধরেছেন কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস আর কাশ্মীর নিয়ে মিথ্যে প্রপাগণ্ডা। এবং আজকের কাশ্মীরের আসল 'সত্য'। যে সত্যের পক্ষে সকলকে থাকতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী।

অত্যন্ত দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা সঙ্গে সেই সময়কার কাশ্মীরের সত্য ঘটনাকে নিজের ছবির মধ্যে জীবন্ত করে তুলেছেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী

ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী দেশের দীর্ঘদিনের একটি বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ছবিটা করেছেন। কীভাবে পাকিস্তানপন্থীরা দেশের একাংশ দখল করে নিয়েছে তা এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদক নিজে ২০১১-তে কাশ্মীরের একটা প্রত্যন্ত প্রান্তে গেলে একটি দশ বছরের ছেলে পথ আটকে বলেছিল, এখানে এসেছ কেন? তুমি তো ইন্ডিয়ান। আমি বলেছিলাম, তুমি? ছেলেটি বলেছিল, আমি পাকিস্তান। তুমি এক্ষুনি এখান থেকে ইন্ডিয়াতে ফিরে যাও। সেদিন আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। সেটাই মাল্টিপ্লেক্সের বড়ো পর্দায় আমার চমক লাগল অগ্নিহোত্রীর আনুকূল্যে।

ছবিটির সিনেমাটোগ্রাফি খুব উন্নতমানের। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিবেক ৩৭০ ধারা বিলোপের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। যা ছবিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতের চরিত্রে এক কাশ্মীরি পণ্ডিত অনুপম খেরের অভিনয় তারিফ করার মতো। প্রাণের তাগিদে নিজের বসতভিটে ছেড়ে চলে যাওয়া কত না বেদনাদায়ক। সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন অনুপম। বহুদিন পরে রাধিকা মেননের চরিত্রে পল্লবী যোশীকে মিষ্টি লেগেছে। তাঁর অভিনীত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক চরিত্রটি তিনি দুর্দান্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবির একটা বড়ো অংশ আবর্তিত হয়েছে তাকে ঘিরেই। ডিভিশনাল কমিশনারের চরিত্রে মিঠুন চক্রবর্তী ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন অতুল শ্রীবাস্তব, প্রকাশ বেলোয়ারি, মৃণাল কুলকার্নি-সহ আরও অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী।

ছবিতে শেখ আব্দুল্লাহ, ফারুক আব্দুল্লাহ, মুফতি মহাম্মদ সইদ, মুফতির কন্যা মেহেবুবার কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে। ডিভিশনাল কমিশনারের চরিত্রে মিঠুন চক্রবর্তী আফশোস করেছেন এদের জন্যই কাশ্মীরে তখন হত্যালীলা ঠেকানো যায়নি। শেখ আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তার মন্তব্য, দিল্লিতে তিনি ন্যাশনালিস্ট। জম্মুতে কমিউনিস্ট। শ্রীনগরে কম্যুনালিস্ট। পালটা, ডাক্তার প্রকাশ বলেন, এরাই আসলে সেকুলারলিস্ট। যা সত্যি ভাবায়।

শিশুর সামনে মায়ের মাথায় বন্দুক ধরে শ্লীলতাহানি ও খুন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাড়ি থেকে বার করে এনে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে হত্যা। এমনকী শিশুর মাথার খুলি উড়ে যায় গুলিতে। দর্শক আসনে বসে শিহরিত হতে হয়।

মনে হয়, হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান আর্মি কাশ্মীরে যদি সন্ত্রাসবাদীদের এনকাউন্টার করে, তবে ঠিকই করে। নরেন্দ্র মোদী ঠিকই বলেছেন, কাশ্মীরের এতদিনের বিকৃত ইতিহাসকে দাবিয়ে দিয়ে 'সত্য' প্রকাশ করেছে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'। ■

বৃহন্নলা মিডিয়ার কটাক্ষ এড়িয়ে পুষ্কর পণ্ডিতের বাজিমাত

‘ভারত তেরে টুকড়ে হোঙ্গে’ সাকার হওয়ার পথে অনেক কাঁটা বিছিয়ে দিল দ্য কাশ্মীর ফাইলস। মানুষ জাগছে। ভারতের জনতা সত্যটাকে জানার জন্য উদ্‌গ্রীব।

নিখিল চিত্রকর

বিবেক অগ্নিহোত্রী এ আপনি কী করলেন? দীর্ঘ বছর ধরে ধামাচাপা দেওয়া সত্যটাকে এভাবে গোটা বিশ্বের সামনে এনে ফেললেন! কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর হওয়া রক্তাক্ত নির্যাতন, তাঁদের তিলে তিলে মেরে ফেলার নির্মম পাশবিকতা, সেই অত্যাচার আড়াল করতে কংগ্রেসি মিডিয়ার বেহায়া প্রচেষ্টা এবং জেএনইউ-এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিচ্ছিন্নবাদীদের সমর্থন করা শিক্ষকদের মগজধোলাইয়ের ব্যবসা— এভাবে হাটের মাঝে সব কিছুর হাঁড়ি ভেঙে দিলেন। আপনার তৈরি ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ ছবিটি এই মুহূর্তে সারা ভারতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া হট টপিক। ছবি দেখে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরোনো দর্শকের চোখের জল বাগ মানছে না। কেউ কেউ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ারেই বসে আছেন। এই সব ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। আর ১৯৯০-এর ১৯ জানুয়ারির বিভীষিকাময় দিনটিতে যেসব কাশ্মীরি পণ্ডিত ভিটেমাটি ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে জীবিত থাকা মানুষগুলো আর তাদের বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা ছবিটি দেখে সেই বাস্তব নৃশংসতা অনুভব করতে পারছেন এই ২০২২-এও।

ইয়ে ক্যায়সী আজাদি পায়ী/অপনে হি মুলক মে নির্বাসিত কী জিন্দেগী

(এই মুহূর্তে সারা দেশ ডুবে আছে বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত দ্য কাশ্মীর ফাইলস ছবিটিতে। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ছবি তৈরির বিষয়ে অনেক কথা জানিয়েছেন পরিচালক। স্বস্তিকায় প্রকাশিত হলো তার বাংলা অনুবাদ)

• কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে ছবি করার কথা ভাবলেন কেন?

বিবেক : আমার তো মনে হয় যারাই মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবেন তারাই এই ছবি করার কথা ভাববেন। ভারতীয় সিনেমায় সত্য ছাড়া সবই দেখানো হয়। সিনেমার পর্দায় কাশ্মীর হলো সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। কিন্তু এটাই কি একমাত্র সত্য? আমি প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে

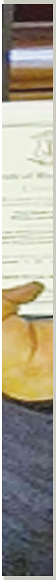

যারা হাতে বন্দুক তুলে নেয়নি তাদের নিয়ে আমার ছবি : বিবেক অগ্নিহোত্রী

চেয়েছি। যারা মার খেয়েও হাতে বন্দুক তুলে নেয়নি তাদের কথা বলাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

• গবেষণার পর্বটি কেমন ছিল?

বিবেক : পল্লবী আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আলাদা-আলাদা গবেষণা করব। কিন্তু কীভাবে করব জানতাম না। ঠিক করলাম, কাশ্মীরের গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ৭০০ জনকে ইন্টারভিউ করব। এদের জীবনের মর্মান্তিক কাহিনি শুনতাম আর কাঁদতাম। আমার মনে হতো, এত মানুষ খুন হলো, এত মহিলা ধর্ষিতা হলেন, তাদের স্তন কেটে নেওয়া হলো— অথচ এরা কেন কেউ কিছু বললেন না? বলতে পারেন এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই ঠিক করলাম, আমরা পর্দায় রাজনীতির গল্প না বলে মানুষের গল্প বলব।

• অভিনেতা নির্বাচন কতটা কঠিন ছিল?

বিবেক : আমরা চেয়েছিলাম প্রত্যেক অভিনেতা যে-যার চরিত্রের মধ্যে মিশে যান। আমি যদি মিঠুন চক্রবর্তীকে বলি, ছ'মাস দাড়ি কামাতে পারবেন না— তা হলে তিনি তাই করবেন। এমনকী তার জন্য যদি অন্য ছবির অফার ছেড়ে দিতে হয় তা হলেও কুছপরোয়া নেহী। মিঠুনদা যা বিশ্বাস করেন তার জন্য যে কোনও আত্মত্যাগে সব সময় রাজি। অনুপম খেরও তাই। আমার সৌভাগ্য এদের সাহায্য পেয়েছি।

• ছবি তৈরির সময় কী ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন?

বিবেক : একটা সময় গেছে যখন সিনেমা না ডকুমেন্টারি কী তৈরি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। একবার তো মনে হলো সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলিজ করে দিই। সেইমতো আমাদের পুরো গবেষণাকে ভাগও করে নিয়েছিলাম। এই দ্বিধার কারণ তীব্র মানসিক সংকট। গণহত্যা নিয়ে যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা সকলেই বলেছেন, এই প্রথম কেউ তাদের এই নিয়ে কোনও প্রশ্ন করল। এসব কথা তারা বাড়িতেও আলোচনা করেন না। এই নীরবতা অবাক যেমন করে, দুঃখও দেয়। এই ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তীর সংলাপ আছে : টুটে হুয়ে লোগ বোলতে নেহী। উনহে শুনা যাতা হ্যায়।

• এই ছবি করার জন্য আপনাকে তো প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

বিবেক : তার জন্য আমি চিন্তা করি না। আমাদের ভাবনাচিন্তা এখনও ঔপনিবেশিক। তবে একটা কথা বলতে পারি, ওরা আমাকে খুন করতে পারে কিন্তু ভাঙতে পারবে না।

• এর পরের ছবি কী নিয়ে করবেন বলে ভাবছেন?

বিবেক : এপ্রিলের পর থেকে পরের ছবির চিত্রনাট্য লেখার কাজ শুরু করব। ছবির নাম দিল্লি ফাইলস। তাসখন্দ ফাইলে আমার মেসেজ ছিল, মানুষের সত্য জানার অধিকার। দ্য কাশ্মীর ফাইলসে বিচার পাওয়ার অধিকার। আর দ্য দিল্লি ফাইলসে আমার মেসেজ হবে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার।

(সৌজন্য : দ্য ফার্স্ট পোস্ট ডট কম)

বিতায়ী/আজাদ তো পুরা বতন হুয়া/পর কিঁউ ইসকি কিমত আজাদিকে বাদ ভী হমনে চুকাই। —এ কেমন স্বাধীনতা পেয়েছি/নিজের দেশেই নির্বাসিত হলাম/পুরো দেশ স্বাধীন হলো, কেন তার মূল্য স্বাধীনতার পরেও আমরা দিলাম। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এক্সোডাসের বেদনাদায়ক অনুভূতির উল্লেখ করেছিলেন সাহিল ভরদ্বাজ '৯২ সালে। ১৯৯০ সালে জানুযারির ১৯ তারিখে পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হকের কলকাঠিতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিতকে উচ্ছেদ করেছিল স্থানীয় জেহাদি মুসলমানরা। যদিও এর আগেও অন্তত ছ'বার কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। ৯০-এর এক্সোডাস আগের ঘটনাগুলোকে ছাপিয়ে গেছিল নারকীয়তার নিরিখে। ভূস্বর্গেই জন্ম নেওয়া হিন্দু পণ্ডিত আশুতোষ রায়না সাত বছর আগে তাঁর একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলেন সেদিনের নৃশংসতা। তাঁর জবানিতে, 'অগণিত হিন্দু পণ্ডিতকে সেদিন দিনের আলোয় খুন করা হয়েছে। উপত্যকার সবুজ গালিচার রং বদলে হয়েছিল রক্তাক্ত। যেসব পরিবার কাশ্মীর ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছিল তাঁদের পুরুষদের বলা হয়েছিল, মহিলাদের রেখে পত্রপাঠ বিদায় হতে। সন্তানের সামনেই মা-কে ধর্ষণ করে আড়াআড়ি দু-টুকরো করা হয়েছিল দেহটা। আরও, আরও অনেক নারকীয় ঘটনা ঘটিয়েছিল কাশ্মীরের সংখ্যাগুরুরা সেদিন। তাদের বর্বরতা, পশুকেও হার মানায়।'

বিবেকবাবু, আপনি সেসব দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন পর্দায়। যে যন্ত্রণাদগ্ধ অতীত এতদিন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বয়ে বেড়িয়েছেন, আপনি তার অংশীদার করে দিলেন গোটা ভারতকে। আদতে কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতরা চিরকালই শান্তিপ্রিয়। কাশ্মীরে তাঁদের ৫ হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। উপত্যকার হিন্দু পণ্ডিতরা সকলেই ব্রাহ্মণ। এদেশের সমাজ-ইতিহাস-সাহিত্যে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা চিরকাল মুনসিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। উপত্যকার খ্যাতনামা হিন্দু পণ্ডিত কলহন ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন রাজতরঙ্গিনী। গ্রন্থটি তৎকালীন কাশ্মীরের একটি সমাজ-দলিল এবং ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ। হিন্দু পণ্ডিতদের সেইসব রচনা, পুঁথি সাংস্কৃতিক আকর পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেমন করেছিল আওরঙ্গজেবরা। ১৯৯০-এর কাশ্মীরেও রাতারাতি মন্দিরগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, হিন্দুত্বকে মুছে দেওয়ার জোরদার চেষ্টা চালিয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কিন্তু চাইলেই তো আর ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। সত্য হলো ফুলের সুগন্ধের মতো। যেখানেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক সুবাস ছড়াবেই। ২০২২-এর দোরগোড়ায় এসে সেই সত্যটাকেই সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন আপনি বিবেকবাবু।

দুদিন আগেই একটা এফএম স্টেশনে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলসে'র রিভিউ শুনলাম। এবং অবাক হলাম। রেডিয়ো জকি বললেন, 'যদি পপকর্ন খেতে খেতে সিনেমা দেখার মজা উপভোগ করতে চান তো দ্য কাশ্মীর ফাইলস একদম দেখবেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলা বাজারি পত্রিকাগুলো তো রীতিমতো বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ দিয়ে ছবির সমালোচনায় লিখেছে দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র নিয়ে এই ছবি দেখবেন না। এটি একটি ফিচার ফিল্ম। কেবল একটি সিনেমাই।

শ্রদ্ধেয় বিবেক অগ্নিহোত্রী, সত্যি বলছি, জ্ঞান হওয়া ইস্তক এই ধরনের ফিল্ম সমালোচনা কোনওদিন শুনিনি বা দেখিনি। আসলে যে পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলটা ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোকে ঝুরঝুরে করে দিয়েছে, তাদেরই কিছু নমক-হারাম- মিডিয়া এখনও যে শিকড় গেড়ে রেখেছে তা বোঝা যায়। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গণহত্যা, এবং তাদের উচ্ছেদের নিষ্ঠুরতাকে ঢাকতে তৎপর মিডিয়াগুলোর দাসানুদাস মনোবৃত্তি এখনও বেশ প্রকট। তাই 'গঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' বা শাহরুখ খান অভিনীত 'রসে' ভরপুর হালফিলের সিনেমাগুলি নিয়ে মিডিয়ায় যেমন হইচই চোখে পড়ে, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটছে। যেমন দ্য কাশ্মীর ফাইলস বক্স অফিসে কত ব্যবসা করলো, কোভিড দুরবস্থা কাটিয়ে ঠিক কত সংখ্যক দর্শক আবার হলমুখী হলো তার প্রকৃত তথ্য আপনি জানতে পারবেন না। আসলে জানতে দেওয়া হবে না। তবুও ছবির নির্মাতারা বলছেন ছবির ব্যবসা যথেষ্ট সন্তোষজনক। ছবিটি মুক্তির আগে কমল নাহাট্টার মতো বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, দ্য কাশ্মীর ফাইলস ৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করবে। মাত্র ১৪ কোটি টাকার ছবিটি সাতদিনেই ১০৪ কোটি টাকা উপার্জন করেছে বক্স অফিসে। সাফল্যের আনুপাতিক হার যথেষ্ট ঊর্ধ্বমুখী।

২০২০ সালে পরিচালক বিধুবিনোদ চোপড়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে 'শিকারা' নামে ছবি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তথ্য বিকৃতির অভিযোগে দুষ্ট হয় ছবিটি। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ছবিটি বন্ধ করার আবেদন জানান। কিন্তু দ্য কাশ্মীর ফাইলসকে জীবন্ত দলিল বলে অভিহিত করছেন খোদ ভুক্তভোগীরাই। এখানেই আপনার সাফল্য বিবেকবাবু। কারণ আপনি তো শুধু অর্থ উপার্জনের জন্যই ছবি করেন না। এর আগে 'বুদ্ধা ইন আ ট্রাফিক জ্যাম, দ্য তাসখন্ত ফাইলসের মতো ছবি করেছেন। সবকটাই গবেষণাধর্মী। বক্স অফিসে তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি। তাও আপনি কি থেমেছেন? বিবেকবাবু, আপনি 'দ্য আরবান নক্সাল' লিখলেন। সেখানেও শোরগোল ফেলে দিলেন। আরেক ধাপ এগিয়ে দ্য কাশ্মীর ফাইলসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'পুষ্কর পণ্ডিতের' ছাঁচে ফেললেন অনুপম খেরকে। যিনি নিজেই কাশ্মীরি পণ্ডিত। কার্যত তাঁর জীবনের সেরা অভিনয়ের দলিল হয়ে থাকলেন পুষ্কর পণ্ডিত।

জেএনইউয়ের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদ সমর্থনকারী যত প্রতিষ্ঠান ভারতে আছে তারা এখন থেকেই প্রমাদ গুনছে। কারণ তাদের স্লোগান 'ভারত তেরে টুকড়ে হোঙ্গে' সাকার হওয়ার পথে অনেক কাঁটা বিছিয়ে দিল দ্য কাশ্মীর ফাইলস। মানুষ জাগছে। ভারতের জনতা সত্যটাকে জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হচ্ছে। তাই হাজার নেগেটিভ রিভিউকে উপেক্ষা করেও ঝাঁকে ঝাঁকে হলমুখী হচ্ছে নবীন প্রজন্ম। তারাই ফিল্মের প্রকৃত রিভিউ দিচ্ছেন ইউটিউবের পর্দায়। সজল নয়নে।

এতদিন বহু সত্যকে আড়াল করে রেখেছে 'নহরওয়ালে' বাবুদের কংগ্রেস। আজ তারা বিলীয়মান। তাই সত্যের উপর থেকে পর্দাটা খুলছে ধীরে ধীরে। এই কাজে অগ্রণী আপনারাই। শ্রদ্ধেয় বিবেক অগ্নিহোত্রী আপনি তো জানেন, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ ছেচল্লিশের দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের ক্ষত নিয়ে আজও নীরবে কাঁদে। অবিভক্ত বাঙ্গলা থেকে যেদিন রাজাকারদের হাতে লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা হয়েছিলেন ঘরের মা-বোনেরা, সেদিন তাদের যন্ত্রণা ছিল কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতোই। তাই দাবি উঠছে, এবার 'বেঙ্গল ফাইলস'ও মুক্তি পাক। শুধু তাই নয়, একে একে সমস্ত বিস্তৃত ফাইলস উঠে আসুক ভারতবাসীর চোখের সামনে। আপনাদের মতো সাহসী চলচ্চিত্রকারদের হাত ধরে প্রকৃত সত্যটা উদ্‌ঘাটন হোক। আর বন্ধ হোক মিডিয়ার ছলচাতুরি।

পুনশ্চ : বাজারি পত্রিকাগুলো যে কোনো ফিল্মের ক্ষেত্রেই রেটিঙের একটা অপশন রাখে। বিবেকবাবু ওরা কিন্তু দ্য কাশ্মীর ফাইলসের সমালোচনায় প্রতিবেদনে কোনো রেটিং রাখেনি। আসলে সত্য ঘটনমার কোনো রেটিং হয় না। ফিচার ফিল্মের হয়। রেটিং না রেখে বাজারি পত্রিকা প্রমাণ দিল দ্য কাশ্মীর ফাইলস কাল্পনিক নয়, পুরোদস্তুর সত্য-নির্ভর ছবি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : (১) দ্য কাশ্মীর ফাইলস একটি জীবন্ত দলিল। (২) ছবিটি দেখে দর্শক আতঙ্কিত হচ্ছেন না। সমবেদনায় কাঁদছেন। (৩) পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ছবিটি অবশ্যই দেখুন। পশ্চিমবঙ্গেও কাশ্মীরের ঘটনা পুনরাবৃত্তি রুখে দিন। ■

প্রাণনাশের হুমকিতে বিচলিত নন বিবেক অগ্নিহোত্রী

অনামিকা দে

ইতিমধ্যেই দেশ বিদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করা 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস্' মুভিটি বিতর্কের ঝড় তুলেছে। একটি সিনেমা আমাদের দেশের ৩২ বছরের পুরনো এক অমানবিক ঘটনাকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী ১৯৯০-এ কাশ্মীরে ঘটে যাওয়া হিন্দু নরসংহার ও তার নেপথ্যের কুশীলবদের মুখোশ খুলে প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন। রাজধানী নতুন দিল্লি থেকে অনতিদূরে স্বাধীন ভারতে সরকারের নাকের ডগায় জেহাদিদের বীভৎসতার বলি হওয়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদের আর্তনাদ কেন চাপা পড়েছিল এতকাল, কেন এই নিরীহ নির্বিরোধী পণ্ডিতদের ওপর দুষ্কৃতীদের অত্যাচারের ভয়াবহ সত্যতা আমাদের সামনে আসেনি, কারা দায়ী এর জন্য— এই সব প্রশ্নেরও খানিকটা উত্তর আমরা পেয়ে যাব এই মুভিটিতে। দোষীদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, সত্য উদ্ঘাটনের জন্য পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর জীবন এখন প্রাণঘাতী বিপন্নতার মুখোমুখি।

এই পরিস্থিতিতে তাঁর জন্য 'ওয়াই' ক্যাটাগরির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন বিবেক, গত ১৮ মার্চ থেকে তাঁর জন্য নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৭-৮ জনের সিআরপিএফ কম্যান্ডো ২৪ ঘণ্টা তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন সিনেমাটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ এমন সময় সিনেমার নির্মাতাদের সঙ্গে সন্ত্রাস যোগের অভিযোগ তুলেছেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতেনরাম মাঝি। আবার জয়রাম রমেশের মতে এই সিনেমা ইতিহাসকে বিকৃত করে আদতে হিংসাকেই তুলে ধরেছে। এদিকে সত্য ঘটনানির্ভর এই সিনেমাটি করতে গিয়ে বিবেক বলছেন ঘটে যাওয়া অন্যান্য গণহত্যার কিছু না কিছু ছবি পাওয়া যায় কিন্তু কাশ্মীর গণহত্যার ছবি তিনি কোথাও পাননি। তাঁকে বিশ্বময় ঘুরে ঘুরে সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছে। সেই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই ছবিটি তৈরি। অথচ আমাদের রাজ্য সাহেবা বলছেন সিনেমাটি নাকি সম্পূর্ণ কল্পকাহিনি। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু উৎসব যেমন দোল, সবেবরাত— এইগুলোকে মাথায় রেখেই নাকি বিরোধী রাজনৈতিক

ইতিহাসের সত্যতা তুলে ধরে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী — প্রধানমন্ত্রী মোদী

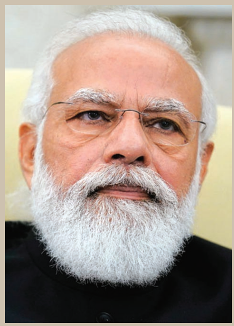

'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু তাই নয়, বিজেপির সাংসদদেরও সিনেমাটি দেখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মোদীজী বলেছেন— 'ইতিহাসকে সত্যতার সঙ্গে সঠিক সময়ে সমাজের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র জগৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যদি মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ওপর সিনেমা তৈরি হতো তবে সারা বিশ্ব গান্ধীজীর মহাত্মা হয়ে ওঠার কাহিনি জানতে পারত। ইমার্জেন্সির সময় নিয়েও কেউ কোনো ফিল্ম বানাতে পারেনি, কারণ সত্যকে নিরন্তর ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দেশভাগের কথা স্মরণ রাখার জন্য যখন ১৪ আগস্ট পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন বহু জায়গা থেকে আপত্তি এসেছে। কিন্তু কেন? ভারত বিভাজনের ঘটনা থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। এর ওপরেও সিনেমা তৈরি হওয়া প্রয়োজন।' 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমাটি প্রশংসার যোগ্য কারণ পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রকৃত সত্যকে ফিল্মের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যারা বা যে গোষ্ঠী গত কয়েকদিন ধরে ফিল্মটি রিলিজ হওয়ার পর থেকে চারিদিকে বিতর্কের ঝড় তুলেছে, তাদের উদ্দেশ্য হলো যাতে ফিল্মটি সঠিকভাবে প্রদর্শিত না হয়। সত্যের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে উলটে এর বিরোধিতা করে চলেছে তারা। বর্তমান সমাজে ইতিহাসের সত্যতা তুলে ধরা চিত্র পরিচালকদের কর্তব্য, যা বিবেক অগ্নিহোত্রী দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছেন।

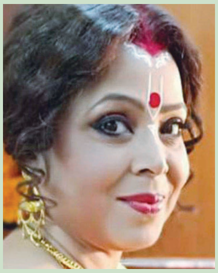

সাংস্কৃতিক জাগরণ ছাড়া ভণ্ডামি বন্ধ হবে না

শর্বরী মুখার্জি

আজকের ভারতবাসী ভাবতে বাধ্য হচ্ছে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সত্যি কাহিনি আসলে কী? কংগ্রেসের মিথ্যাচারিতা, তাদের বার বার এটা প্রমাণ করার চেষ্টা যে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা পালিয়ে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বামপন্থী বন্ধুদের সেটাকে সাজিয়ে উপস্থাপনা করা— এই সমস্তটারই পর্দা ফাঁস হয়েছে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এ। আজকে সকলের চোখ খুলে গেছে। সত্যিটা সামনে এসেছে। অবশ্যই ভালো লাগছে ভারতব্যাপী এই আলোড়ন দেখে। এখন কথা হচ্ছে, বাঙ্গলায় কী হচ্ছে! পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতির পীঠভূমি। আমরা যদি মনে করি একটা পরিবর্তন আনব বা মানুষকে পরিত্রাণ দিতে চাই তাহলে শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি করলে হবে না, এখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লব তৈরি করতে হবে। কখনো গানে, কখনো কবিতায়, কখনো থিয়েটারের মঞ্চে, কখনো সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে তার প্রতিফলন করতে হবে।

সহযোগিতা পেলে বেঙ্গল ফাইল তৈরি করতে পারি

পাপিয়া অধিকারী

ফারুক আবদুল্লাহ সেইসময়ে প্রায় আশি জন টেররিস্টকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন। উদ্দেশ্য, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নৃশংসভাবে খুন করা। এই নরসংহার তো শুধু একটি নির্দিষ্ট সময় নয়, যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। জেহাদিরা স্বাধীনতার নামে হিন্দু নিধন চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেও আমরা ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর দেখেছি হিন্দু নিধন। কীভাবে মহিলাদের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার হয়েছে। আমি চাই কাশ্মীর ফাইলসের মতো বেঙ্গল ফাইলস তৈরি হোক। সঠিকভাবে সহযোগিতা পেলে আমি নিজেই করতে চাই এই ধরনের ফিল্ম।

কাশ্মীর ফাইলস অস্কারের জন্য নমিনেটেড হওয়া উচিত

কঙ্গনা রানাওয়াত

প্রত্যেক ভারতবাসীর এই ফিল্ম দেখা উচিত। বলিউডকে বলিদাউদ ইন্ড্রাস্ট্রি বানানো পরিচালক প্রযোজকদের সময় হয়েছে অপরাধ জগতের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে এই ফিল্মটিকে যথাযথভাবে প্রমোট করার। 'দ্য কাশ্মীরি ফাইলস' বানিয়ে বিবেক অগ্নিহোত্রী, অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী, পল্লবী যোশীরা বলিউডে হওয়া বিগত দিনের অনেক পাপ ধুয়ে দিয়েছেন। তাঁদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। এত বলিষ্ঠভাবে সত্যকে চিত্রনাট্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। আমি মনে করি ফিল্মটি অস্কার পুরস্কারের জন্য নমিনেটেড হওয়া উচিত।

দল একটি বিশেষ সিনেমাকে নিয়ে মাতামাতি করছে, কারণ তারা নাকি এর আড়ালে একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে।

এর থেকে একটা কথা তো পরিষ্কার, সিনেমাটিতে যেরকম জেএনইউ-র প্রফেসরের সন্ত্রাসবাদী চেহারা সামনে এসেছে ঠিক তেমনই এই বিরোধিতার যোগসূত্রগুলোও ওই একই সূত্রে বাঁধা। সিনেমা হলের বাইরে পোস্টার না দেওয়া বা প্রমোশন আটকানো বা মুভিহলের ভিতরে বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করা এরই প্রতিফলন। দিনকয়েক আগে সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, কাশ্মীরে ফিরে আসা পণ্ডিতদের জন্য ইতিমধ্যে ১,০২৫টি বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে, আরও ১,৪৪৮টি বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। যাঁরা ফিরছেন, তাঁদের নগদ টাকা ও খাবার দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে বোঝাই যাচ্ছে একটি সামান্য অংশই কাশ্মীরে ফিরেছেন, সিংহভাগ কাশ্মীরি পণ্ডিত আজও উপত্যকার বাইরে দিন কাটাচ্ছেন। এই বাস্তব পরিস্থিতিতে বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সেই পণ্ডিতদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার নির্মম ঘটনাও এই সন্ত্রাসের মূল কারণ তুলে ধরেছেনএবং তার সঙ্গে বর্তমান ভারতে চোরাবালির মতো জেহাদিদের কর্মকাণ্ডও তুলে ধরেছেন।

এদিকে অসম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো সিনেমাটিতে করছাড় দিয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যে অর্ধদিবসের ছুটি ঘোষণা করেছেন যাতে সকলে সিনেমাটি দেখতে পারেন। কিন্তু ওদিকে মহারাষ্ট্রে উলটো চিত্র, সেখানে উদ্ধব ঠাকরের সরকার জানিয়েছে এই সিনেমায় করছাড় দেওয়া হবে না। পশ্চিমবঙ্গেও মমতা সরকার করছাড় দেয়নি। মহারাষ্ট্রে বিজেপি এর বিরোধিতা করেছে এবং বলেছে শিবসেনা ক্ষমতার লোভে হিন্দুদের দুর্দশার কথা ভুলতে বসেছে। ■

বর্ষ প্রতিপদ পৃথিবীর আদি নববর্ষ

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

অমরবাবু হাওড়ার শিবপুরে এক বর্ধিষ্ণু এলাকায় বাস করেন। একটি সরকারি ব্যাঙ্কের চাকুরে। একমাত্র ছেলে অনির্বাণ কলিকাতার একটি বিখ্যাত কনভেন্ট স্কুলে সেভেনের ছাত্র। সেদিন বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যায় অমরবাবু অফিস থেকে ফিরতেই ছেলে এসে সামনে দাঁড়ালো। প্রশ্ন, 'বাবা, বল তো কে ঠিক, আমি না শোভন?' শোভন অনির্বাণের খেলার সাথী। থাকে এখানেরই এক বস্তিতে। তার বাবা লেদ কারখানার শ্রমিক, পড়ে ক্লাস সেভেনে। স্থানীয় এক স্বল্পপরিচিত বিদ্যামন্দির স্কুলে। ছেলের প্রশ্নে অমরবাবু বলেন, 'কী ঠিক, কী বেঠিক সেটা তো বল?' অনির্বাণ চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, 'জানো আজ কী হয়েছে? খেলার মাঠে শোভন এসে বললে পরশু নাকি নববর্ষ। তুমি বল, পরশু তো ২ এপ্রিল। ২ এপ্রিল কখনও নববর্ষ হয়? নববর্ষ তো ১ জানুয়ারি, সে তো কবেই চলে গেছে। শোভনকে কত করে বোঝালাম, এই তো মাস তিনেক আগে ৩১ ডিসেম্বর রাত্রি ১২ টায় নববর্ষ পালন হলো। কত আসতবাজি পুড়ল, চিৎকার-হুল্লোড়, ক্লাবে ক্লাবে ফিস্টের ধুম। পরের দিন সকালবেলা ১ জানুয়ারি আমরাও সব বন্ধুরা মিলে ফিস্ট করলাম, কত আনন্দ হলো, সেটাই তো নববর্ষ। এর থেকে বড়ো নববর্ষ আর হয় নাকি? শোভনটা একটা বাজে স্কুলে পড়ে দিন দিন বোকা হয়ে যাচ্ছে, তাই না বাবা?'

অমরবাবু খাঁটি বাঙ্গালি। একমাত্র সন্তান খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পড়ে অন্যের থেকে একটু বেশি শিক্ষাদীক্ষা পাক, এটা চান ঠিকই, তবে নিজের বাঙ্গলিয়ানা সম্পর্কে স্বাভিমান যথেষ্টই। ছেলেকে একটু বাঙ্গালিয়ানার পাঠ দিতে বললেন, 'ঠিক বলেছিস, তবে সামনের এপ্রিলের ১৫ তারিখও এক বড়ো নববর্ষ। ওই দিন বাংলা বছর ১৪২৮ পেরিয়ে ১৪২৯-এ পড়বে। সেদিন বাঙ্গালির নতুন বছর শুরুর বাংলা নববর্ষ।' অনির্বাণ তো হেসেই অস্থির। বলে, 'সে না হয় হলো কিন্তু বলো দেখি ২০২২ সাল বড়ো না ১৪২৯? কোন নববর্ষ পুরানো? ২০২২-এর খ্রিস্টাব্দ, না ১৪২৯-এর বাংলা নববর্ষ?' ছেলের প্রশ্নে অমরবাবু কুপোকাত। বলেন, 'সে তুই ঠিকই বলেছিস। প্রাচীনতার দিক থেকে দেখলে খ্রিস্টাব্দই প্রাচীন নববর্ষ। আর এর সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্টের জন্মের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।' অনির্বাণ বলে ঠিক বলেছো, আমাদের স্কুলের ফাদার জোসেফ ডি' সুজাও সেদিন ওই কথা বলছিলেন। খ্রিস্টাব্দই হলো পৃথিবীর আদি ও সবচেয়ে প্রাচীন নববর্ষ। কারণ মুসলমানদের নতুন বছর হিজরি তো মাত্র ১৪৪৩ বছরের, বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ বছর, আরও কম, কিন্তু খ্রিস্টাব্দ ২০২২, কত বেশি।"

অমরবাবু পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধিতে বেশ আশ্বস্ত হন। ভাবেন এই হলো কনভেন্টে পড়ানোর লাভ। ছেলে একদম গোড়া থেকেই সঠিক জিনিস শিখছে। এই কারণেই তাঁর খাঁটি বাঙ্গালি হওয়া সত্ত্বেও মিশনারি স্কুলের প্রতি এত শ্রদ্ধা-বিশ্বাস। অনির্বাণ বলে, 'তবে বাবা, শোভন যে অন্য কথা বললে? বললে এই ২ এপ্রিলও নাকি এক 'নববর্ষ', সেটা কী?' ছেলের প্রশ্নে অমরবাবু হতচকিত হয়ে যান। না, ২ এপ্রিল কোনো নববর্ষ পড়ছে বলে তো মনে আসছে না। কী উত্তর দেবেন ছেলেকে? ছেলে আবার বলে, 'কী গো বলো? পরশু ২ এপ্রিল সে কোন নববর্ষ?' অমরবাবুর কপালে চিন্তার ভাঁজ। অনেক ভেবেও উত্তর খুঁজে পান না। বলেন, 'কই এরকম কোনো নববর্ষ আছে বলেতো জন্মেও শুনিনি। তো তুই শোভনকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিসনি?' অনির্বাণ বলে, 'বলিনি আবার? কিন্তু যা উত্তর দিল সে যে একটা পুরো ইতিহাস লেখা হয়ে যাবে। আমিও কোনদিন কারও কাছে সেসব কথা শুনিনি।'

বিস্মিত অমরবাবু বলেন, 'কী বলল শুনি'? অনির্বাণ বলে, 'শোভনদের স্কুলে সংস্কৃত পড়ানো হয়। সেই সংস্কৃতের শিক্ষক জ্ঞানতোষবাবু তাদের ক্লাসে গল্প করেছেন পরশু যে ২ এপ্রিল আসছে তা হলো বাংলা চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি। এ হলো ভারতীয় নববর্ষের প্রথম দিন—'বর্ষ প্রতিপদ'। হিন্দুদের যে ১৮টি পুরাণ আছে তার মধ্যে 'ব্রহ্মপুরাণ' বলে একটি পুরাণ আছে। সেখানে আছে আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পূর্বে বর্ষপ্রতিপদের দিনেই সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এই তিন যুগ শেষ হয়ে এখন কলিযুগের ৫১২৩ বছর চলছে। তাই ইংরেজি নববর্ষ মাত্র ২০২২, হিজরি ১৪৪৩, আর বাংলা ১৪২৮ বছরের এই সেদিনের। কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীন নববর্ষ 'বর্ষপ্রতিপদ' লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন।

অমরবাবু বিস্মিত! 'বলিস কী? এসব কথা তো আগে কখনও শুনিনি।" অনির্বাণ বলে চলে, 'শোভন বলছিল এই শুভতিথি নাকি অনেক স্মরণীয় ঘটনারও সাক্ষী। ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক নাকি এই দিনেই হয়েছিল। আবার দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে ধর্মরাজ্য স্থাপনকারী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই তিথিতেই সিংহাসনে বসেন। আবার...।'

অমরবাবু ছেলেকে থামান "আরে দাঁড়া দাঁড়া। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির এতো কবেকার মান্ধাতা আমলের গল্প কথা। আধুনিক যুগে এই দিনের কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে কী?

অনির্বাণ বলে, 'তাও বলেছে। ২০৭৮ বছর পূর্বে মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিদেশি দস্যু শকদের মেরে তাড়িয়ে হিন্দুদের মনে বিজয়ী চেতনার সঞ্চার করে 'শকারি বিক্রমাদিত্য'

উপাধি ধারণ করেছিলেন। সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের তিথিও ছিল চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথি। সেদিন থেকে তিনি 'বিক্রম সংবৎ' নামে এক কাল গণনাও শুরু করেন।'

এবার অমরবাবু একটু আশ্বস্ত হন। হ্যাঁ, এই কথাগুলোতে যেন অল্পবিস্তর চেনা চেনা ঠেকছে। এগুলো ছোটবেলায় ইতিহাসে পড়েছেন তিনি। অনির্বাণ বলতে থাকে, 'শুধু তাই নয়, ঠিক তার ১৩৫ বছর পর দাক্ষিণাত্যে অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশের বীর রাজা শালিবাহন পুনরায় এদেশ আক্রমণ করতে আসা শক দস্যুদের প্রবল বিক্রমে পরাজিত ও ধ্বংস করেন। আর এই প্রতিপদ তিথিতেই তিনি এক নতুন বর্ষগণনা পদ্ধতি 'শকাব্দ'-এর সূচনা করেন, যা বর্তমানে ১৯৪৩ শকাব্দ চলছে।'

এবার অমর বাবুর চোখে-মুখে হারিয়ে পাওয়ার পরিতৃপ্তি। ''ঠিক বলেছিস, এ তো আমাদের সাব্জেক্টেই ছিল। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা বটে।''

অনির্বাণ আবার শুরু করে 'শুধু তাই নয়, পরাধীন ভারতে বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই প্রতিপদ তিথিতেই 'আর্য সমাজ' নামে একটি হিন্দু সমাজ সংস্কারক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। যার নেতৃত্বে বহু ভিন্ন ধর্মে চলে যাওয়া হিন্দু পুনরায় নিজ হিন্দুধর্ম্মে পরাবর্তন করেছিল। এই চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথি যে কেবল পৃথিবীর প্রাচীন নববর্ষ তাই নয়, ভারতের বহু মহামানবের পুণ্য জন্মতিথিও বটে। যেমন—সিন্ধু প্রদেশের মহান সন্ত ঝুলেলাল, শিখ ধর্মের দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদদেব (১৫৩৯), হিন্দু সমাজ সংস্কারক ও সংগঠক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার (১৮৮৯) এই তিথিতেই মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে জন্মেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের অন্যতম সেনানী, আমাদের সংবিধান প্রণেতা ড. বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরও এই মহান তিথিতে জন্মেছিলেন। তারপর...।'

অমরবাবু নিষ্পলক চোখে অনির্বাণের কথাগুলো যেন গিলে চলেছেন। এর কিছু কিছু যে তিনি একদমই জানতেন না তা নয় কিন্তু এই দিনের মাহাত্ম্য, এত বিস্তৃত ইতিহাস তিনি ইতিপূর্বে কারোর কাছেই শোনেননি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আরও আছে?'

অনির্বাণ বলে, 'আছেই তো। শোভন বলছিল এই চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথি নাকি 'নবরাত্র'-এর প্রথম দিন। এদিন থেকে নয় দিন পর্যন্ত এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ যশ, পরাক্রম ও সিদ্ধিলাভের আশায় দেবী দুর্গার আরাধনা করে। এই চৈত্র শুক্ল নবমী তিথিকে বলে 'নবরাত্র', যাকে আমরা 'রামনবমী' হিসেবে পালন করি। আর এই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীই হলো রাজা সুরথের প্রবর্তিত দুর্গা পূজা, বাঙালির আজকের বাসন্তী পূজা।' এতগুলি কথা বলে অনির্বাণ থামল।

ছেলের কথা শুনতে শুনতে অমরবাবু যেন কোন চিন্তার রাজ্যে চলে গেছেন। অনির্বাণ বলে, 'বাবা বল তো, যেগুলো শোভন বলল, সেগুলো কি ঠিক? আমি তো মানতেই চাইনি, বলেছি হতেই পারে না। খ্রিস্টাব্দই প্রাচীন নববর্ষ। কিন্তু সে শুনতেই চায় না। এখন তুমি বলো কে ঠিক শোভন না আমি?'

অমরবাবু ভেবে চলেছেন—শোভনের মাস্টারমশাই ভারতবর্ষের যে সুপ্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি-পরম্পরার কথা বলেছেন খ্রিস্টাব্দ তো তার কাছে শিশু সমান। সত্যি তিনি তো কোনোদিন এসব কথা ভেবে দেখেননি। বাঙালি জাত্যাভিমানের অহংকারে ১ লা বৈশাখকে বাঙ্গালি নববর্ষ হিসেবে ভারতের সবচেয়ে পুরনো ও একমাত্র নববর্ষ ভেবে কখন যে অবচেতন ভাবে খ্রিস্টানদের খ্রিস্টাব্দকে বেশি মান্যতা দিয়ে ফেলেছেন তা বুঝতেই পারেননি। অথচ এই বাঙ্গালি সমাজ যা এক সুবিশাল হিন্দু সমাজের কণামাত্র, তার ইতিহাস, পরম্পরা, ঐতিহ্যের খোঁজ তিনি কোনোদিন করেননি। ইংরেজি নববর্ষ ১ জানুয়ারি নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে নিজেদের দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর সুপ্রাচীন সনাতন হিন্দু নববর্ষকে গুরুত্বহীন করে তুলেছেন। আমরা পরিবারের অভিভাবকরাই যদি দেশের ঐতিহ্যের প্রতি এমন নির্লিপ্ত থাকি তবে আগামী যুব সমাজ কার কাছে এসব শিখবে, সংস্কার পাবে? আমাদের সন্তানরা কার শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে উঠবে—বিদেশি ভাবধারায় পরিপুষ্ট খ্রিস্টান কনভেন্টের ফাদার জোসেফ ডি' সুজার বিদেশি শিক্ষায়, নাকি পাড়ার অখ্যাত স্কুল 'বিদ্যামন্দির'-এর তথাকথিত স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষক জ্ঞানতোষ বাবুর শিক্ষায়? কপালে চিন্তার ভাঁজ। ছেলেকে বলেন, 'অনির্বাণ, তোর বন্ধু শোভন বোধহয় ঠিক কথাই বলেছে রে। বর্ষ প্রতিপদই পৃথিবীর প্রাচীন নববর্ষ।''

বাবার কথায় অনির্বাণ যেন হতচকিত হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে—'তবে আমি ভুল, শোভন ঠিক'!

অমরবাবু বলেন, ''তুই ভুল নয় বাবা, ভুল আমি। এর জন্য আমিই দোষী। আমি ভেবেছিলাম কনভেন্টে পড়া ইংরেজি জানা ছেলে-মেয়ে গুলো বুঝি বেশি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হয়। আজ আমার ভুল ভেঙেছে। এখন বুঝছি তারা ইংরেজি ভাষায় হয়তো একটু কথা বলতে পারে, এগিয়ে থাকতে পারে কিন্তু জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধিতে তারা 'বিদ্যামন্দিরের' মতো ছোটো ছোটো স্কুলগুলির থেকে ঢের ঢের পিছিয়ে।''

এই উত্তরে অনির্বাণ হতাশ হয়, ''তবে কী হবে বাবা? আমি কি শোভনের মতো এদেশকে কখনও জানতে পারব না? শোভন সব জেনে যাবে, আর আমি বোকা হয়েই থাকব? আমি যে কনভেন্টে পড়ি!''

অমরবাবু ছেলেকে বলেন, 'তা কেন আগামী রবিবার আমি তোকে নিয়ে জ্ঞানতোষবাবুর বাড়ি যাব। তোকে সপ্তাহে একদিন সংস্কৃত শেখাতে অনুরোধ করব, সঙ্গে সঙ্গে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস, সভ্যতা, দর্শন এগুলোও। সংস্কৃত শিখলে এদেশকে তুই জানতে পারবি, এখন মন খারাপ করিস না।' বাবার উত্তরে অনির্বাণের মুখে হাসি ফোটে, বলে, 'তবে পরশু ২ এপ্রিল চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথি, হিন্দু নববর্ষ তার কী হবে?'

অমরবাবু সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'কী আর হবে, আমাদের ঘরে ধুমধাম করে 'হিন্দু নববর্ষ' পালন হবে।

'কাল মাঠে গিয়ে তোর বন্ধুদেরও নেমন্তন্ন করে আয়। আমি গিয়ে শোভনের মাস্টারমশাই জ্ঞানতোষবাবুকে ডেকে আনব। তিনি আমাদের সকলের সামনে বর্ষ প্রতিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলবেন। সেদিন সকলে মিলে দেশের কথা শুনবো।'

বাবার কথা শুনে অনির্বাণের চোখ মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

(বর্ষ প্রতিপদ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

বুদ্ধ-পূর্ণিমায় অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার-উৎসব

দেবাশিস চৌধুরী

বারো মাসে তেরো পার্বণ ভারতীয় সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল ধারা। লাদাখ থেকে তামিলনাড়ু বা অরুণাচল থেকে গুজরাট, ভারত জুড়ে বছরভর কোনো না কোনো একটা উৎসব দেখা যাবেই। এইরকমই এক নারী-বর্জিত জনজাতি উৎসবের নাম 'দিসুম সেন্দ্রা', যে উৎসবে একমাত্র পুরুষদেরই যোগদানের অধিকার থাকে। জনজাতিদের ভাষায় 'দিসুম সেন্দ্রা'। এর বাংলা অর্থ 'শিকার-উৎসব'।

বছরের একটি বিশেষ দিনে জনজাতি সমাজের জোয়ান মরদেরা মেতে ওঠেন শিকারের নেশায়। সেদিন পশুরক্তের ধারা বয়ে যায় পাহাড়ের জঙ্গলে। তবে আশার কথা, সরকার ও এনজিও-দের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় জনজাতি সমাজও আজ যথেষ্ট সচেতনার পরিচয় দিচ্ছে শিকারের নামে পশুহত্যা বন্ধ করে এই 'শিকার-উৎসব'কে একটা প্রতীকী রূপের মধ্যে প্রতিফলিত করতে। এখন পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে 'শিকার-উৎসব' নিষিদ্ধ হলেও এই সেদিন ২০০৭ সালেও এই উৎসবের চল ছিল আর তা একদম কাছ থেকে নিজের চোখে দেখার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম।

'দিসুম-সেন্দ্রা' বা 'শিকার-উৎসব'-এর বিষয়টি প্রথম জানতে পারি একবার ব্যক্তিগত কাজে পুরুলিয়ায় এসে। অফিসের সহকর্মী শ্যামলদার উৎসাহেই ২০০৭ সালে এই শিকার উৎসব দেখতে আসার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। মে মাসে বুদ্ধ-পূর্ণিমার আগের দিন সূর্যাস্ত থেকে শুরু হয়ে পরেরদিন সূর্যোদয় অবধি শিকারের সময়কালটি নির্দিষ্ট। সেই অনুযায়ী ট্যুর-প্রোগ্রাম তৈরি করে WBCADC-তে ঘর বুকিং থেকে চক্রধরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে টিকিট রিজার্ভেশন সব সেরে রাখি।

যাওয়ার দিন রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম। ভাগ্যিস ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পরপরই উঠে পড়েছিলাম, পরে হলে হয়তো উঠতেই পারতাম না। বনগাঁ লোকালকে হার মানিয়ে মিনিট দশকের মধ্যে ট্রেনে আর পা ফেলার জায়গা নেই, খেটো ধুতি পরা অস্ত্র হাতে কালো মানুষের ঢল নেমেছে আজ। লোয়ার বার্থের তলা থেকে শুরু করে পাখার খাঁজ, যেদিকে চোখ যাচ্ছে শুধুই অস্ত্র আর অস্ত্র। বর্শা, টাঙ্গি, তির-ধনুক, টাঁর (পশু ধরার ফাঁদ) কী নেই। মনে হচ্ছে যেন 'সাঁওতাল-বিদ্রোহ'-এ অংশ নিতে যাচ্ছি। এক একটা বার্থে আট-দশজন করে বসে, 'রিজার্ভেশন' শব্দটাকে প্রহসন বললেও কম বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা দু-আড়াই বাদে ট্রেন ছাড়ল, সারারাত কীভাবে কাটল তা একমাত্র মারাং বুরুই জানেন। যে সময়ে ট্রেনের পুরুলিয়া ঢোকার কথা, ঢুকল গড়বেতায়।

মে মাসের গরমে আধসেদ্ধ হয়ে পুরুলিয়া পৌঁছে ভাবলাম ট্রেন এবার খালি হবে। ও হরি, শুনলাম ট্রেন খালি হবে সেই উরমা স্টেশনে। পাশে বসেছিলেন মধ্যবয়সি গঙ্গা মাহাত, আসছেন হুগলির ধনেখালি থেকে। প্রায় বছর বিশেক ধরে টানা আসছেন এই শিকার-উৎসবে অংশ নিতে। কথায় কথায় গল্প জমে উঠল, তাঁরা উরমা স্টেশনে নেমে প্রথমে খাওয়া-দাওয়া সারবেন, পরে রোদের তেজ কমলে অস্ত্র কাঁধে হাঁটা দেবেন অযোধ্যা পাহাড়ের পথে। শিকারের সন্ধানে সারা রাত ধরে চষে বেড়াবেন জঙ্গলের 'গভীরিয়া' (কোর এরিয়া)। শুধু উরমার দিক দিয়েই নয় সিরকাবাদ, বাঘমুণ্ডী, খয়রাবেড়া, ঝালদা-সহ বিভিন্ন দিক দিয়ে আজ শিকারিরা ঢুকবেন গভীরিয়ার পথে। শিকার পেলে সূর্যোদয়ের পর যাবেন অযোধ্যা পাহাড়ের বুড়বুড়ি মাঠে, সেখানে সবাই শিকার করা পশুদের নিয়ে হাজির হবেন। চলবে শিকারের প্রদর্শনী, সমবেত জনতার উল্লাসে গর্বে বুক ফুলে উঠবে শিকারিদের।

কথার মাঝে চলে এল উরমা স্টেশন। বিদায় জানিয়ে নেমে গেলেন গঙ্গা মাহাত।

খালি হলো পুরো ট্রেনও। আমরা আরও এগিয়ে এসে নামলাম বরাভূম স্টেশনে। বরাভূমে নামার আসল কারণ ছিল দেড় কিলোমিটার দূরে বলরামপুর এসে গালার তৈরি জিনিসপত্র দেখা ও কেনাকাটি করা। এই অঞ্চলে এখনও প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা চাষ হয়। কিন্তু ট্রেন লেট করার কারণে ওখানে যাওয়ার প্ল্যান বাতিল করতে হলো। স্টেশন চত্বরে দুপুরের লাঞ্চ সেরে একটা গাড়ি বুক করে রওনা দিলাম অযোধ্যা পাহাড়ের পথে। বাঁশিড়ি, মাঠাবুরু পেরিয়ে বাঘমুণ্ডী হয়ে একসময় পৌঁছে গেলাম অযোধ্যা পাহাড়ে WBCADC-এর নীহারিকায়।

বিকেল হতেই শিকারিদের ঢল নামল অযোধ্যা পাহাড়ের বুকে। অস্ত্রকাঁধে ধামসা-মাদল বাজাতে বাজাতে একের পর এক শিকারির দল চলেছে জঙ্গলের ভিতরে। সন্ধ্যা হতেই দূরের গ্রামগুলি থেকে ভেসে এল বাজনার দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজ। রাত যত গভীর হচ্ছে বাড়ছে আওয়াজও। মনে হচ্ছে টাইম মেশিনে চড়ে ফিরে এসেছি এক আদিমযুগে।

শ্যামলদাকে বললাম, 'চল, যে কোনো একটা দলে ভিড়ে যাই'। কিন্তু শ্যামলদা বললেন, 'এখন বিশ্রাম নিয়ে বরং ভোররাতে জঙ্গলে ঢোকাই উচিত হবে'। দাদার পরামর্শ মেনে রাত তিনটের পর জলের বোতল আর টর্চ হাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে এলাম। একটু অপেক্ষা করার পর দেখি একটা দশ-বারোজনের দল আসছে, দলের সর্দারের কাছে আমাদের ইচ্ছের কথা জানাতে সঙ্গে নিতে রাজি হয়ে গেলেন।

—'এই 'শিকার-উৎসব'-এ জীবনে একবার হলেও আসতে হয়'। পথ চলতি গল্প জুড়েছি দলের সর্দার কার্তিক ওঁরাওয়ের সঙ্গে। যেতে যেতে শুনছি এই উৎসবের গোপন রহস্য— 'নইলে সমাজে 'মরদ'-এর স্বীকৃতি মিলবে না আর যদি শিকার পায় তো কথাই নেই। কিন্তু জঙ্গলে নির্বিচারে গাছ কাটা আর চোরা-শিকারিদের দৌরাত্ম্যে শিকার যেমন দিনকে দিন কমছে, হ্রাস পেয়েছে শিকারিদের দক্ষতাও। তবু আজও একটা মাদকতা আছে এই পরবে আর তার টানেই প্রতিবছর হাজির হই। শেষবারের মতো শিকার পেয়েছি ছয় বছর আগে, প্রায় কুড়ি কেজিটাক একটা বরা শিকার করেছিলাম। জানেন, আমাদের ঘরে ঘরে এই শিকার-পরবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় এক-দেড় মাস আগে থেকেই। টাঁর তৈরি থেকে অস্ত্রে শান দেওয়া, তখন কত কাজ। পরবের দিন যাত্রা করার আগে সমাজের প্রথা মেনে নিজের হাতে স্ত্রী-র হাতের নোয়া খুলে তাকে 'বিধবা' করে ঘরে রেখে আসতে হয়। জঙ্গলের মধ্যে বিপদ যে শুধু বন্যপশুদের থেকেই আসবে এমনটা নয়, অন্যদলের থেকেও আসতে পারে। ধরুন একটা পশুকে দুটো দলই অস্ত্রে বিঁধেছে, ব্যাস শুরু হয়ে গেল তরজা। মুখের ঝগড়া একসময় খুনোখুনির পর্যায়েও চলে যায়। আগে যদিও বুড়বুড়ি মাঠে বিবাদ মেটানোর জন্য একজন 'লায়া' (বিচারপতি) থাকত, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জঙ্গলের মধ্যেই লাশ পড়ে যেত। তবে একবার লাশ পড়েছিল বুড়বুড়ি মাঠে লায়ার বিচারসভাতেও। আর সেই থেকেই উঠে গেল বিচারসভা। সেবার হয়েছিল কী, লায়ার বিচার মনঃপুত না হওয়ায় একজন তর্ক জুড়েছিল, লায়া টাঙ্গির এক কোপে তার মুণ্ডু নামিয়ে দিয়েছিল। শিউরে উঠবেন না, আজকের দিনটিতে অযোধ্যা পাহাড়ে কোনো আইনের শাসন চলে না, শুধুই জঙ্গলরাজ।'

অন্ধকার কেটে আলো ফুটেছে অনেকক্ষণ। আমরা শিমুলবেড়ার দিক দিয়ে গভীরিয়ায় ঢুকেছিলাম। প্রায় ঘণ্টা চারেক হয়ে গেছে ঘুরছি জঙ্গলের কোর এরিয়ায়, জন্তু-জানোয়ার দূরে থাক একটা পাখিও চোখে পড়ল না, শুধু মানুষ আর মানুষ। একদলের সঙ্গে অন্যদলের দেখা হলেই চলছে শিকারি-সম্ভাষণ, 'আ বুঁইয়া বুঁইয়া' আর আমরাও ওই বলে প্রত্যুত্তর জানাচ্ছি অন্যদলকে। একসময় ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। দলের সর্দার আমাদের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'শিকার করা দেখতে চাইলে আপনাদের উচিত ছিল বিকেলবেলাতেই অন্য দলের সঙ্গে জঙ্গলে ঢোকা। তবে না ঢুকে ভালোই করেছেন, ওই সময় জীবনহানির আশঙ্কাও থাকে। আমরা বছর তিনেক ধরে এখন ভোররাতের দিকেই আসি মূলত সমাজের নিয়মরক্ষা করতে'।

ফিরে এলাম বুড়বুড়ি মাঠে। মাঠ তখন জনসমুদ্র। যেদিকে যে দল শিকার পেয়েছে সেইদিকেই মানুষের জমায়েত বেশি। শিকার কাঁধে নিয়ে কোনো নতুন দল মাঠে ঢুকলে লোকেও শিকার দেখতে দৌড়াচ্ছে সেইদিকে। আমরাও দুজনে ঘুরতে ঘুরতে দেখে চলেছি একের পর এক শিকার, কোথাও বরা, খরগোশ বা গোসাপ আবার কোথাও বা হরিণ। একদিকে জটলা দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখি এই দলটি একটি হরিণ শিকার করেছে। মাথা কাটা হরিণের দেহটি পড়ে আছে মাটিতে, পেটের কাছে বল্লমের আঘাতে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। ভিড় একটু হালকা হতে বিড়ি বাড়িয়ে আলাপ জুড়লাম দলের সর্দারের সঙ্গে। জানতে চাইলাম তাঁর আজকের এই শিকারের অভিজ্ঞতার কথা। বিড়ি জ্বালিয়ে একরাশ ধোঁয়া উগরে বলতে শুরু করলেন আজকের টাটকা শিকারের গল্প, 'আমার নাম ধর্মা হাঁসদা। বারোজনের দল আমাদের, আসছি সেই টাটা থেকে। ট্রেনে এসে উরমায় নেমে জঙ্গলে ঢুকি সন্ধ্যের পর। গভীরিয়ার দিকে এগুনোর সময় ভালো করে নজর রাখছিলাম পাহাড়ি 'সোঁত' (বর্ষার জলের ধারায় বছরের পর বছর ধরে প্রাকৃতিক ভাবে পাহাড়ের গায়ে সৃষ্টি হওয়া অগভীর খাত)-গুলির দিকে। রাতের বেলায় এই সোঁতেই জন্তুজানোয়ারের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মাঝরাত নাগাদ এইরকমই একটা সোঁতে উঁকি মারতেই দেখি এই ব্যাটা লুকিয়ে আছে। দলের কয়েকজন মিলে টাঁর হাতে নিয়ে সোঁতের নীচের দিকে গিয়ে আড়াআড়ি ভাবে বিছিয়ে ধরে রাখল আর আমরা বাকি তিনদিক থেকে বুঁইয়া বুঁইয়া বলে চিৎকার করতে করতে তাড়া দিলাম। ব্যাটা তাড়া খেয়ে টাঁরে সেঁধুতেই বল্লম ছুঁড়লাম, সোজা পেটে গিয়ে বিঁধল। তারপর টাঙ্গির এক কোপে মুণ্ডুটা নামিয়ে দিতেই...আ বুঁইয়া বুঁইয়া'। বুঝলাম শিকারের টাটকা স্মৃতির উত্তেজনায় সর্দার এখনো বেশ মুডেই আছে।

মাঠ থেকে হোটেলে ফিরে এলাম। এই বছরের মতো 'দিসুম সেন্দ্রা' পরবের সমাপ্তি। না, এখুনিই সমপ্তি বলি কী করে। উপসংহারের মতো এখনো বাকি রয়ে গেছে পরবের অন্তিম পর্ব, শিকারিদের নাচ-গানের পর্ব। সন্ধ্যের পর গুটিগুটি পায়ে দুজনে আবার হাজির হলাম সেই বুড়বুড়ি মাঠে। এই বুড়বুড়ি মাঠকে নিয়ে প্রবাদ আছে, বনবাসকালে তৃষ্ণার্ত সীতামায়ের জন্য এই মাঠেই শ্রীরামচন্দ্র পাতালভেদী বানে জল তুলেছিলেন। সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত ছোট্ট এই অগভীর জলাশয়ের জলে আজও তলা থেকে বুড়বুড়ি ভেসে ওঠে। রাত বাড়ার সঙ্গে জঙ্গলের লম্বা গাছগুলির মাথা ছাড়িয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমার গোলপানা চাঁদ আকাশে ঝলমল করেছে। খোলা আকাশের নীচে দু-চারখানা বাঁশের খুঁটি পুঁতে তাতে হ্যাজাক টাঙিয়ে আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। একসময় শিঙা বাজিয়ে শুরু হলো জনজাতি নাচ-গানের আসর। মূল চরিত্রের মধ্যে দুটি নারী-চরিত্র, সেজেছে কিন্তু দু'জন পুরুষ। ভাষা ঠিকমতো না বুঝলেও মানে বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। আদিরসাত্মক বিষয়বস্তু নিয়ে নাচ-গানের মাধ্যমে নাটক পরিবেশিত হচ্ছে আর অশ্লীল সংলাপের তালে তালে দর্শককুলও উচ্ছ্বসিত হয়ে একজন অপরজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে আকণ্ঠ মহুয়ার প্রভাবে। শুধু মানুষই নয়, নেশার আমেজে আজ যেন গোটা অযোধ্যা পাহাড়টাই টলছে। মাঝরাতের পর হোটেলে ফিরে এলাম। রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালেই বাস ধরে সিরকাবাদ হয়ে নেমে যাব পুরুলিয়া শহরে, তারপর ট্রেন ধরে বাড়ি। □

বামপন্থীরাই বাঙ্গালির সর্বনাশের মূলে

পুলক নারায়ণ ধর

তথাগত রায় রাজনৈতিক দিক থেকে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, নিজেকে যিনি 'বাঙ্গালি হিন্দু' বলে পরিচয় দিতে অন্য অনেকের মতো বিড়ম্বিত বোধ করেন না। এমন একজন ব্যক্তি যখন কিছু লেখেন তা নিশ্চয় গুরুত্ব লাভ করে ও আলোচনার দাবি রাখে। তাঁর রচিত 'বামপন্থা ভয়ঙ্করী'— বাংলায় ও বিদেশে এমনই একটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী গ্রন্থ।

দেশ বিভাগ ও দেশমাতৃকাকে হারানোর ব্যথা তিনি অনুভব করেছেন। দেশ বিভাগের অবর্ণনীয় দুর্দৈব খণ্ডিত বাঙ্গলার এই অংশে যা-(হতভাগ্য) পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত তা আরও বর্ধিত হয়েছে তথাকথিত বামপন্থী রাজনীতির দুষ্টচক্রের দ্বারা যার চালকের আসনে বসেছে কমিউনিস্টরা। তাদের কলাকৌশল ও ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনা মিথ্যা মোহময় আদর্শের মোড়কে ঢাকা। এই ধ্বংসাত্মক কমিউনিস্ট অভিসন্ধি ও কাণ্ডকারখানা লেখক উন্মোচন করেছেন আলোচিত গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কোনো দলীয় ভাবনা বা স্বার্থ তাঁর বোধকে আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর পূর্ব রচিত অন্য একটি গ্রন্থ 'My People uprooted' (যা ছিল আমার দেশ)-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্তমান আলোচিত গ্রন্থটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

লেখক তাঁর প্রতিবাদ্য বিষয়ের ভূমিকা হিসেবে একটি সংগত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। 'বাঙ্গালি কি স্বভাবতই বামপন্থী'? আরও একটি প্রশ্ন 'কোনো বাঙ্গালি, হিন্দু না মুসলমান, ভারতীয় না বাংলাদেশি? বামপন্থার আদর্শগত ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দেশ ও বিদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও-জে-দঙের চিন্তা, বিভিন্ন ধারার তত্ত্ব রাশিয়া, চীন, কম্বোডিয়া, উত্তর কোরিয়া কীভাবে কাজ করেছে এবং দেশের বিপর্যয় ঘটিয়েছে এ সম্পর্কে তথ্যমূলক আলোচনা আছে। এ প্রসঙ্গেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। স্তালিন, মাও, পলপটের নিরঙ্কুশ 'ডিকটেটরে'র ভূমিকাই বামপন্থীদের আদর্শ। বিরোধী মত বা সন্দেহজনক বিরোধীদের নির্বিচারে দমন ও হত্যাই ছিল কমিউনিস্টদের দস্তুর যা সীমিত ক্ষমতার পরিসরে এ রাজ্যেও বামপন্থীরা করে দেখিয়েছে।

গ্রন্থটির দুটি অংশ। (১) বাঙ্গলার বামপন্থা : প্রয়োগ ও পরিণাম এবং (২) বিদেশে বামপন্থা তত্ত্ব, প্রয়োগ ও পরিণাম। গ্রন্থকারের মূল অনুসন্ধানের বিষয় বর্তমান বাঙ্গালির অধঃপতনের সূত্রপাত কীভাবে হলো এবং তা থেকে উত্তরণের পথ কোথায়। এই অনুসন্ধান প্রয়াসে তিনি শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত থাকলেও তথাগতবাবু নিরপেক্ষ ভাবে বামপন্থীদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করেছেন, এ বিষয়ে বলতে কোনো দ্বিধা নেই। গ্রন্থের প্রাক্‌কথনে সাহিত্যিক সমীর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, লেখক 'নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক। কোথাও কোনো 'বায়াস' নেই।' প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সাল থেকেই বামপন্থীরা যা ভেবে এসেছে বা করে এসেছে সেই ঘটনাবলী যদি পরপর সাজিয়ে দেওয়া যায় তাতেই এদের নেতিবাচক চরিত্র উন্মোচিত হয়। এক্ষেত্রে ঘটনাই এদের চরিত্রের প্রকাশ। মন্তব্য একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। লেখকের কোনো সিদ্ধান্তই ব্যক্তিগত নয়। ঘটনার কথা ঘটনাই বলবে (Facts speak for themselves)। যে বামপন্থার চাষবাস পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে হচ্ছে তা লেখকের মতে 'সাধারণ অর্থে বামপন্থা

ফঃ ৫

নয়, এর নাম হওয়া উচিত বাঙ্গালি-বামপন্থা'।' এ বিষয়ে লেখক দীর্ঘ ইতিহাস চর্চা করেছেন যা আজকের বেশিরভাগ বাঙ্গালি ভালো করে জানেন বলে মনে হয় না। বাঙ্গালির মনের কাঠামোতে এক অদ্ভুত বামপন্থা ঠাঁই পেয়েছে। এই বামপন্থাকে লেখক 'বাঙ্গালি-বামপন্থা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এই 'বাঙ্গালি' শব্দটিও তিনি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেননি। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালির ধারায় 'হিন্দু-বাঙ্গালি'র কথাই বুঝিয়েছেন। কোনো ধানাইপানাই নেই। প্রশ্ন উঠবে 'শুধু বাঙ্গালি হিন্দু কেন? বাঙ্গালি মুসলমান নয় কেন?' উত্তর : 'নয় কারণ এই দুই সম্প্রদায় এই বইয়ের আলোচনার বিষয় অনুযায়ী পরস্পরের বিপ্রতীপের। বাঙ্গালি হিন্দুর বিলুপ্তি মানে বাঙ্গালি মুসলমানের পূর্ণ অভ্যুত্থান।'

এই দুই সম্প্রদায়ের সমাজ-ব্যবস্থায় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরম লক্ষ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বড়ো পার্থক্য আছে। অর্থাৎ হিন্দু বাঙ্গালি মানসিকতার সঙ্গে বামপন্থা বহুদূর পর্যন্ত খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু বাঙ্গালি মুসলমান তার দৃষ্টিকোণ থেকে বামপন্থাকে তার সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বলে মনে করে। এর বেশি কিছু নয়। তার 'মস্তিষ্কের গভীরে' বামপন্থা আদর্শ হিসেবে জায়গা পেতে পারে না। বাঙ্গালি মুসলমান প্রথমে মুসলমান এবং পরে অন্য কিছু। বামপন্থা তাদের বিচারে কোনো আদর্শই নয়। হিন্দু বামপন্থীদের কাছে বামপন্থা একটি আদর্শ যা তার পিতৃপুরুষের ধর্মের ওপরেই স্থান পায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে লেখক মনে করেন যে হিন্দু বাঙ্গালিকে তার চিন্তার মূল ভূমি থেকে সরিয়ে আনার কাজটি বহুলাংশে করেছে বামপন্থীরা। কিন্তু মুসলমান বাঙ্গালিকে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করে 'ধর্মনিরপেক্ষ' করা যায়নি। লেখকের বিচারে এইখানেই পশ্চিমবঙ্গের বিপদ। বাঙ্গালিকে আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক বলে চিৎকার করে একটি বিপজ্জনক বিষয় থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে। নিজ ধর্মকে বর্জন করে 'আন্তর্জাতিক' হয়ে ওঠা হিন্দু বাঙ্গালির পক্ষে সম্ভব হলেও মুসলমান সম্প্রদায় বামপন্থী আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী নয়। তারা ধর্ম ভিত্তিক আন্তর্জাতিকতায় অনুস্যূত।

১৯৪১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত হিসাব করলে বাঙ্গালি হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ। অপরপক্ষে মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৩০০ শতাংশ। এই বাস্তব বোধ বামপন্থীদের ছিল না। আজও নেই। এবং এদের চিন্তাধারা অনুসরণ করে অনেক অ-বাম বুদ্ধিজীবীরাও এই ধারা বহন করে চলেছে। এটাই বর্তমানে (হিন্দু) বাঙ্গালিদেরও মনোভাব তৈরি করেছে বলে লেখকের বিশ্লেষণ। এই মনোভাবে স্থাপিত যে 'বামপন্থা' যা লেখকের দৃষ্টিতে 'বাঙ্গালি-বামপন্থা', 'শুধু বামপন্থা নয়'। এই বামপন্থা বাঙ্গালি- হিন্দুর মৌলিক মূল্যবোধকেই বদলে দিয়েছে। বাঙ্গলার 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধোগতির অন্যতম কারণ এই মূল্যবোধ পরিবর্তন বা বলা ভালো বিকৃতি। অর্থাৎ 'ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগানসর্বস্ব রাজনীতি ও জঙ্গিপনা বাঙ্গালির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো বিষয়ে বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়ে মতবিরোধ ঘটলে তা তর্ক যুক্তির পদ্ধতির বদলে বাহুবলে নিষ্পত্তি ঘটাবার সংস্কৃতি বামপন্থীদের অবদান। ব্যবসা বাণিজ্যে যা এককালে বহু বাঙ্গালি বুদ্ধিমত্তার ছাপ রেখেছিলেন তা বামপন্থীদের দৃষ্টিতে একটি শোষণ ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হলো। 'মুনাফা' একটি সার্বিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য না হয়ে বামপন্থীদের বিচারে হয়ে দাঁড়ায় একটি 'পাপকর্ম'। ব্যবসায়ী মাত্রই ঘৃণার পাত্র। এই ভাবে বাঙ্গালি যুবকদের ক্রমশ শিল্প সৃষ্টিমূলক বা ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখা হলো। শুধু সরকারি চাকরির আশার ছলনায় ভুলিয়ে রাখা হলো। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ধ্বংস করা এবং 'সরকারি' প্রতিষ্ঠানগুলিকে লুটপাটের ক্ষেত্রে পরিণত করা হলো। এর সঙ্গে দুর্দান্ত গতিতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলো যার অভিধা হলো 'বিপ্লব'। বাঙ্গালি তথা ভারতীয় বিপ্লবী ও মনীষীদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা বা তাঁদের অবদানকে ছোটো করে দেখিয়ে কিশোর যুবকদের মধ্যে ত্যাগ, তিতিক্ষা মান্যতা ও দেশপ্রেমের আদর্শ ও ধারণাকে বিলুপ্ত কর হলো। একমাত্র শ্রমিক বা মেহনতি মানুষই মানুষ এমন অবান্তর ধারণা তাদের সুকুমার মনে গেঁথে দেওয়া হলো। দেশ, সংবিধান, গণতন্ত্র মিথ্যা। জাতীয় পতাকা ঝুটা আজাদির পতাকা। এই হলো বামপন্থী শিক্ষা।

এই ধারায় পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের নিয়ে বামপন্থীদের কাজই হয়ে দাঁড়াল 'উদ্বাস্তু'দের খেপানো। এরাই বামপন্থীদের ভোটের বাক্স হয়ে উঠল। উদ্বাস্তুদের অনিশ্চিত জীবনযাত্রায় বেঁধে রাখতে চেষ্টা করে। আন্দামানে বসতি স্থাপনে প্রাণপণ বাধা দিয়ে যায়। লেখক একটি হিসেবে জানাচ্ছেন যে ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আন্দামানে যত কৃষিজীবীর বসতি হলো তার মধ্যে পঁচাশি শতাংশেরও বেশি পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু। এই 'নতুন প্রাণের স্পন্দন' থেকে বিপুল সংখ্যক পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু বাঙ্গালিকে বামপন্থীরা বঞ্চিত করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ওপর প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করে এবং মিথ্যা বিপ্লবের কল্পনার জালে আবদ্ধ করে বামপন্থীরা বাঙ্গালির সর্বনাশ করেছে। এর ভার আজও আমাদের বহন করে যেতে হচ্ছে। বামপন্থীদের দেওয়া আশ্বাসে বিশ্বাস করে উদ্বাস্তুরাও ওদের ভোট দিয়েছে। এই কারণে কংগ্রেসের অতুল্য ঘোষ প্রমুখ নেতারা উদ্বাস্তুদের জন্যও কিছু করেননি।

এরপরে এল বামপন্থীদেরই প্ররোচনায় দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ওপর অমানবিক অত্যাচার ও হত্যা (প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ— ১৯৭৮)। এই উদ্বাস্তু রাজনীতি ও বামপন্থীদের ভণ্ডামির বিশ্লেষণ পাওয়া যায় অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর 'The Marginal Men'

এবং সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের 'বঙ্গ সংহার এবং...' গ্রন্থে। এই ভাবে একের পর এক নেতিবাচক আন্দোলন ও ভাবধারা প্রচার করে বামপন্থীরা বাঙ্গালির মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দিয়েছে। এরই পরিপূরক হয়ে এল নকশাল-আন্দোলন (১৯৬৭-তে শুরু)। বাঙ্গালির চরিত্রে শেষ কফিন-পেরেকটি মেরে দিল উগ্র বামপন্থী নকশাল আন্দোলন। হত্যা, সন্দেহ, ভয়ভীতি অর্থাৎ Fear Psychosis বাঙ্গালিকে একেবারে কুঁকড়ে দিল। আজ দুষ্ট রাজনৈতিক দল ও চক্র তার পূর্ণ ব্যবহার করছে। একের পর এক শিল্প, ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল। শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা ও শ্রমজীবী মানুষ ভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছে কাজের সন্ধানে। আজ এইসব বাঙ্গালির পরিচয় 'পরিযায়ী শ্রমিক'। কেন? কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে 'ভয়ংকরী' বামপন্থীদের।

শুধু শিল্প বাণিজ্য নয়। বামেরা ধ্বংস করেছে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো অহংকারের বস্তু শিক্ষাকে। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র এরা দলবাজি করেছে। জাল মার্কসশিটের রমরমা এদের আমলেই শুরু হয়েছে। এদের আমলেই চূড়ান্ত হেনস্থার শিকার হয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য। ইংরেজি শিক্ষাকে স্কুলস্তরে বরবাদ করেছে। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে কুঠারাঘাত করেছে ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনকে নির্মূল করতে। অতীতে কম্পিউটার বিরোধী আন্দোলন করে অন্যান্য রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের থেকে বাঙ্গালিদের বহু যোজন পিছনে টেনে রেখে সর্বনাশ ঘটিয়েছে। এক কথায় বামপন্থীদের পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবনে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ও শিক্ষা জগতে কোনো ইতিবাচক অবদান নেই। এটাই লেখকের বক্তব্য। এই বক্তব্যের সঙ্গে ভুক্তভোগী বাঙ্গালির এক মত না হয়ে উপায় নেই। রামকৃষ্ণ মিশনকেও এরা এক সময় হেনস্থা করেছে। বিজন সেতু আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী হত্যাও (২৯ মার্চ ১৯৮০) এক কলঙ্কজনক বামপন্থী আদর্শের নজির।

গ্রন্থটির অপর অংশে বিদেশে বামপন্থা তত্ত্ব প্রয়োগ ও পরিণাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন, কম্বোডিয়া কিউবা প্রভৃতি দেশে কমিউনিজম কীভাবে মানুষকে নির্যাতন করেছে ও পরিণামে মুখ থুবড়ে পড়েছে তা লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করেছেন। অনেকেই হয়তো বেদনাহত হবেন স্তালিন, মাও, পলপট প্রমুখ রাষ্ট্রনেতাদের তিনি হিটলারের সমতুল গণ্য করায়। ভারতের বামপন্থীরা বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি রাশিয়া ও চীনের নেতৃত্বের অনুপ্রেরণায় পরিচালিত হয়ে এসেছে। সেসব দেশ থেকে কমিউনিজম বিলুপ্ত হলেও 'ডিকটেটর শিপ' বিদায় নেয়নি। চীন আজও ওদের 'মডেল'। কমিউনিস্টরা আজও দেশের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শিক্ষা বা আদর্শ গ্রহণ করতে অক্ষম।

লেখক দেশের বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির পথ হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনাকেই একমাত্র পথ বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে কিন্তু লেখকের চিন্তা একমাত্র হিন্দু বাঙ্গালির কাছে আবেদন রাখতে পারে। কারণ মুসলমান সম্প্রদায় বাঙ্গালি বা অবাঙ্গালির কাছে স্বামী বিবেকানন্দ কি গ্রহণযোগ্য? 'হিন্দু' বামপন্থী বাঙ্গালিরাও বিবেকানন্দের নাম করবে না। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে তাদের ধর্ম প্রসারের কথা স্বীকার করেও বলেছেন ভবিষ্যৎ ভারত হবে বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ঐশ্লামিক দেহের সমন্বয়ে গঠিত ভারত। কিন্তু ১০০ বছরের বেশি আগে তিনি যা ভেবেছিলেন তা রূপায়ণ করতে আমরা চেষ্টা করিনি। মুসলমানদের তাদের নেতারা কিছুতেই ঐক্যের পথে যেতে দিল না। বেদান্ত থেকে তারা শত বিপ্রতীপমুখী। এমনকী এরাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ পর্যন্ত বয়কট করেছিল। শ্রদ্ধানন্দস্বামীকে মুসলমান গুন্ডাদল হত্যা করলে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে তার বিরুদ্ধে লেখনী ধরেন। কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা চুপ। বাঙ্গালি মুসলমান নেতারা চুপ। রবীন্দ্রনাথ সেদিন প্রত্যয়িত হলেন সাম্প্রদায়িক হিসেবে। বামপন্থীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং বামপন্থা যে কতটা ভয়ংকরী তা তথগতবাবুর কলমে নির্ভুল ভাবে স্থাপিত হয়েছে। এই বামেদের শিক্ষায় বাঙ্গালি আজ 'পুরোপুরি মুসলমান হবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে দেশে উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা দেশ ভাগের পূর্বাবস্থার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট তাতে হয়তো রবীন্দ্রনাথও মুসলমান বাঙ্গালির কাছে হিন্দু কবি হিসেবে পরিচিত হবেন। গত শতাব্দীর তিনের দশকে তিনি এই তকমাই মুসলমানদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বামপন্থা ও বামপন্থীদের সম্পর্কে এই গ্রন্থটি একটি ব্যতিক্রমী আলোচনা যা কারও পক্ষেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

পুস্তকের নাম : বামপন্থা ভয়ঙ্করী-বাংলায় ও বিদেশে। লেখক : তথাগত রায়। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স, কলকাতা। মূল্য : ৩৫০ টাকা।

With Best compliments from -

A
Well Wisher

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে তৃণমূলের অশ্বডিম্ব প্রসব

মণীন্দ্রনাথ সাহা

গত ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, গোয়া ও মণিপুরের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে এবং উত্তরাখণ্ডে বিজেপি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখল করেছে এবং গোয়া ও মণিপুরে জোটসঙ্গী নিয়ে সরকার গঠন করবে। পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষায় জানানো হয়েছিল— উত্তর প্রদেশে বিজেপি, পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি এগিয়ে থাকবে এবং উত্তরাখণ্ড ও গোয়ায় বিজেপি-কংগ্রেসে জোর টক্কর হবে এবং মণিপুরে ত্রিশঙ্কু হতে পারে। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিজেপি পঞ্জাব বাদে চারটি রাজ্যেই সরকার গঠন করছে।

নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হবার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উত্তরপ্রদেশ। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে আর অখিলেশ যাদবের সমর্থনে ভোট প্রচারে বহু মিথ্যার ফুলঝুরি ছড়িয়ে এসেছেন। সাম্প্রতিক অতীতে পরপর দু'বার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে উত্তরপ্রদেশে কোনও দল ক্ষমতায় ফিরতে পারেনি। তাই যোগী আদিত্যনাথ সেটা করে দেখাতে পারেন কিনা, সেটা নিয়ে সংশয় থাকলেও যোগীজী সফল হয়েছেন। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যের ভোটকে অনেকেই সেমিফাইনাল হিসেবে দেখেছিল। সেই হিসেবে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ফাইনাল ম্যাচে বিজেপি যে বেশি গোল দিয়ে কাপ জিতবে সে আশা করা যেতেই পারে।

ভোটের ফল প্রকাশের পর জানা গেছে— উত্তরপ্রদেশে ৪০৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি-২৭৪, এসপি-১২৪, কংগ্রেস-২, বিএসপি-১ ও অন্যান্য-২টি আসন পেয়েছে। মণিপুরে ৬০টি আসনের মধ্যে বিজেপি-৩২,

এনপিইপি-৭, এনপিএফ-৫, কংগ্রেস-৫ এবং অন্যান্য ১১টি আসন পেয়েছে। পঞ্জাবে-১১৭টি আসনের মধ্যে আপ-৯২, কংগ্রেস-১৮, আকালি-৪, বিজেপি-২ এবং অন্যান্য-১টি আসন পেয়েছে। গোয়ায় ৪০টি আসনের মধ্যে বিজেপি-২০, কংগ্রেস-১২, তৃণমূল জোট-২, আপ-৩ এবং অন্যান্যরা ৩টি আসন পেয়েছে। তবে গোয়ায় তৃণমূল জোট ২টি আসন পেলেও তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে একটিও আসন পায়নি। এ সংবাদ তৃণমূলের কাছে অশনি সংকেত বলেই অনেকে মনে করছেন। কেননা গত বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে গ্যাসভরা বেলুনের মতো উড়তে উড়তে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে দাপিয়ে বেড়াতে লেগেছিল এবং কিছু পেটোয়া (লোকে বলে চটি চাটা) বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদমাধ্যম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চব্বিশে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল তারা নিশ্চয় ভোটের এই ফলে মনমরা হবেন।

তবে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের পরে এখানকার সরকারের আর্থিক হাল কোন পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে এবং শাসকদল তার স্নেহাশ্রিত দুধেল গাই দিয়ে হিন্দুদের কী হাল করেছিল তাও দেশবাসী এবং বিশ্ববাসী জেনে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল। সেই কথা মনে রেখেই উত্তরপ্রদেশবাসী এবং গোয়াবাসী তৃণমূলকে টাটা-বাই বাই জানিয়েছে। কারণ তারা জেনে গেছেন— তৃণমূল বা তৃণমূল সমর্থিত দল যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে তারা ওই রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের মতো শ্মশান করে ছাড়বে। সে কারণে তাঁরা বিজেপির উপর পূর্ণ ভরসা রেখেছেন। উপরন্তু কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যমের ছবিতে দেখা গেছে উত্তরপ্রদেশের এক মসজিদের সিঁড়ির কুঠুরি ভেঙে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও অসংখ্য তরবারি উদ্ধার করেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। সে অস্ত্র ও তরবারি যে, সময় এবং সুযোগ মতো মহান আল্লার বান্দারা কাফেরদের শায়েস্তা করার কাজে লাগাত তা নিশ্চিত করে বলা যেতেই পারে। সেই সঙ্গে আসাউদ্দিন ওয়েসির প্রেমের বাণী— 'যোগী-মোদী চলে গেলে তোদের বাঁচাবে কে?' উত্তরপ্রদেশ ও গোয়াবাসীর চোখ খুলে দিয়েছে এবং ভোটাররা নিশ্চয়ই সেকথা মনে রেখেই ভোট দিয়েছিলেন।

বঙ্গ বিজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ায় এবং উত্তরপ্রদেশে বিজেপিকে হারানোর জন্য বারবার সেখানে গিয়েছেন, বিজেপিকে হারানোর হুমকি দিয়েছেন এবং এই নির্বাচনে মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির সঙ্গে জোট করে লড়েওছিলেন। ফল প্রকাশের আগেই বাঙ্গলা থেকে গোয়ায় উড়ে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফল প্রকাশের দিন তিনি সেখানেই ছিলেন। ভাবখানা এমন তিনি উপস্থিত থেকে নির্বাচনী ফল ঘুরিয়ে দিবেন। কিন্তু শেষমেশ বিরাট একটা অশ্বডিম্ব প্রসব করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না অভিষেকবাবুরা। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যখনই তারা কেরামতি দেখাতে যাবেন তখনই এরকম ঘোড়ার ডিম পাড়তে হবে। কথাটা মনে রাখলে পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে, বাঙ্গালিকে নিয়ে হাসাহাসি করাটা অন্তত কিছুটা হলেও কমবে। □

পরিচ্ছন্নতার বার্তা দিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে তেমসুতুলা ইমসং

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সোনালি অশোকস্তম্ভের প্রতীক দেওয়া আমন্ত্রণ পত্রটি দেখে সেদিন চমকে উঠেছিলেন নাগাল্যান্ডের প্রত্যন্ত নামের মেয়েটি। সরকারি খামের উপর ছাপার অক্ষরে লেখা তাঁর নাম— তেমসুতুলা ইমসং। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে দেশ-বিদেশের প্রায় ৮ হাজার অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে সেদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে হাজির ছিলেন তেমসুতুলা।

ততদিনে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে অল্প বিস্তর নাম-ডাক হয়েছে তেমসুতুলার। শুরুটা ২০১৩ সালে। বারাণসী শহর থেকে কিছুটা দূরে একদিন শূল টঙ্কেশ্বর ঘাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তেমসুতুলা। দেখলেন চারপাশে জমে আছে আবর্জনার স্তূপ। পশুপাখির মলমূত্র এমনকী মানুষের বর্জ্যে ভরে উঠেছে চারদিক। দু মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এমনই দুর্গন্ধের ঠেলা! সেদিনই ঠিক করলেন এই ঘাটের আবর্জনা সরিয়ে চারপাশের সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে দেবেন তিনি। নিজের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, 'সাকার সেবা সমিতি' নিয়ে কোমর বাঁধলেন নাগাল্যান্ড নন্দিনী। প্রথম কাজ হলো স্থানীয় মানুষজন ও তীর্থযাত্রীদের বোঝানো। তাঁদের সচেতন করা। তারপর সবাই মিলে হাত লাগিয়ে এলাকা জঞ্জালমুক্ত করা। এই কাজে স্থানীয় প্রশাসনও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই শূল টঙ্কেশ্বর ঘাট আবর্জনা মুক্ত হলো। পাশেই প্রভুঘাট। এই ঘাটটিকেও পরিচ্ছন্ন করার তোড়জোড় করলেন তেমসুতুলা। তারপর একে একে বারাণসীর অন্য ঘাটগুলিতেও কাজ শুরু করলো 'সাকার সেবা সমিতি'। এভাবেই ভারতের স্বচ্ছতা অভিযানের হাত শক্ত করতে ময়দানে নেমেছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের তেমসুতুলা ইমসং।

কলেজের পড়াশোনা শেষ করে কর্মসূত্রে দিল্লি আসেন তিনি। শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে ২০১৩-তেই বারাণসীর বন্ধুরা মিলে গড়ে তোলেন 'সাকার সেবা সমিতি'। একদিন গঙ্গায় নৌকা বিহারের সময় ঘাটগুলির শোচনীয় অবস্থা দেখে হতাশ হয়েছিলেন তেমসুতুলা। পরের দিনই পৌঁছে গিয়েছিলেন শূল টঙ্কেশ্বর ঘাটে সরেজমিনে দেখতে। তেমসুতুলা তাঁর টিমকে নিয়ে যতবার ঘাট পরিষ্কার করতেন, ততবারই স্থানীয় লোকজন ও তীর্থযাত্রীরা নিমেষে এলাকা নোংরা করে দিত। তিনি মানুষদের ঘাটে আবর্জনা না ফেলার অনুরোধ করলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় সাড়া দিল না। কিন্তু তাঁরা হাল ছাড়েননি। অদম্য মনোভাবের জেরে কাশীর পুনরুজ্জীবন অধ্যায়ে নাম জুড়েছে তেমসুতুলা ও তাঁর টিমের।

২০১৫ সালের ১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে নাগাল্যান্ডের মোকোকচুঙ্গ গ্রামের মেয়ে তেমসুতুলা ও তাঁর টিমের ভূয়সী প্রশংসা করে লেখেন, 'বারাণসীর ঘাটগুলো পরিষ্কার করে সুন্দর করে তুলতে তেমসুতুলা ইমসং-এর এই প্রয়াস অভূতপূর্ব। আমি তাদের কুর্নিশ জানাই'। তারপরই স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী প্রধান কার্যালয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ জানান তেমসুতুলাকে।

প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ভবনের ডাক, প্রধানমন্ত্রীর টুইট এবং পিএমও-তে দেখা করার আমন্ত্রণ সবকিছুই নাগাল্যান্ড কন্যার পরিবেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিরক্ষায় প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর কথায় 'শুভ চিন্তা, শুভ কাজ করতে গেলে বাধা-বিপত্তিগুলো আপনা হতেই সরে যায়। এবং অচিরেই কাঙ্ক্ষিত ফল মেলে'। কাশীর ঘাটগুলির আনাচে-কানাচে আজও সাফাই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে 'সাকার সেবা সমিতি'।

সম্প্রতি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন তেমসুতুলা। তিনি জানান, 'আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে প্রচুর পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয়। স্থানীয় স্তরে রিসাইক্লিঙের মাধ্যমে সেগুলিকে কীভাবে পুনর্ব্যবহার যোগ্য করা যায়, তা নিয়েই সাকার সেবা সমিতি কাজ করছে। তারা বারাণসী শহর ও লাগোয়া গ্রামগুলিতে স্কুল এবং স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের নিয়ে সচেতনতা শিবির গড়ে তুলেছে। পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে স্বতন্ত্র পরিচিতি পেয়েছেন তেমসুতুলা ইমসং। ২০১৬ সালে স্বরাজ্য পুরস্কারে সম্মানিত হন তিনি। তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ◻

তিন বন্ধু

এক জঙ্গলের মধ্যে ছিল একটি বিশাল পুকুর। পুকুরের ধারে একটি গাছে একটি বক বাস করত। বকটির নাম ছিল শতপত্র। পুকুরের মধ্যে বাস করত এক কচ্ছপ এবং জঙ্গলে থাকত একটি হরিণ। বোধিসত্ত্ব সেবার এই হরিণ রূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শতপত্র, হরিণ ও কচ্ছপের মধ্যে ছিল খুব বন্ধুত্ব। তিনজনে খুব আনন্দের সঙ্গে দিন কাটাত। হঠাৎ তাদের জীবনে নেমে এল বিপদ। একদিন এক ব্যাধ এসে হাজির হলো সেই বনে। সে সারাদিন ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। একদিন পুকুরপাড়ে সেই ব্যাধ দেখতে পেল হরিণের পায়ের ছাপ।

ব্যাধ মনে মনে ভাবল, এখানে নিশ্চয় কোনো হরিণ জল খেতে আসে। হরিণকে ধরার জন্য সে পথের উপর চামড়ার তৈরি ফাঁদ পেতে রাখল। প্রতিদিনের মতো সেদিন রাতেও হরিণ এসেছে পুকুরের জল খেতে। ফাঁদের কথা হরিণ বিন্দুবিসর্গ জানতো না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় পুকুরের দিকে। তারপর হঠাৎ ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। সে যতই ছটফট করে ততই চামড়ার দড়িগুলো বেশি করে চেপে বসে। ভয়ে হরিণ চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

বন্ধুর কান্না শুনে সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে নেমে আসে শতপত্র। কচ্ছপও জল থেকে উঠে আসে। বন্ধুকে ফাঁদে পড়ে থাকতে দেখে দুজনেই অস্থির হয়ে ওঠে। তারা ঠিক করে যেভাবেই হোক বন্ধুকে বাঁচাতে হবে। কচ্ছপ শতপত্রকে বলল, বন্ধু তুমি দাঁত দিয়ে ফাঁদের জাল কাটতে থাকো। আর ব্যাধের বাড়ি গিয়ে আমি এমন একটা ব্যবস্থা করছি যাতে সে সহজে এখানে আসতে না পারে।

দুজনে পরামর্শ করে শুরু করল নিজেদের কাজ। শতপত্র রওনা দিল ব্যাধের বাড়ির দিকে। কচ্ছপ শুরু করল ফাঁদের জাল কাটতে। এদিকে শতপত্র হাজির হয় ব্যাধের

বাড়ির সামনে। ভোরের আলো তখনোও ভালো করে ফোটেনি। একটু পরে ব্যাধ শিকার ধরার আশায় একটা লাঠি নিয়ে বের হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বক একটা অদ্ভুত শব্দ করে ব্যাধের চোখে মুখে পাখার ঝাপটা মারতে থাকে। ব্যাধ খুব রেগে গিয়ে বলে, পাখিটা তো খুব অপয়া আর বদমায়েশ। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। শতপত্র ভাবলো অপয়া ভেবে ব্যাধ নিশ্চয় সামনের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরোবে। তাই সে পেছনের দরজার পাশে গিয়ে লুকিয়ে থাকলো।

একটু পড়ে ব্যাধ পেছনের দরজা দিয়ে বেরুতে গেল। ব্যাধকে দেখতে পেয়েই শতপত্র আবার পাখার ঝাপটা মারল। ব্যাধ ভাবলো দিনটাই খারাপ যাবে। ভালোভাবে রোদ উঠলে বের হওয়া যাবে। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

রোদ যখন চারদিকে ঝলমল করছে তখন ব্যাধ আবার বের হলো। শতপত্রও উড়ে চলে এল পুকুরপাড়ে। কচ্ছপকে বলল, যা করার তাড়াতাড়ি করো। ব্যাধ আসছে। কচ্ছপ জালের দড়ি কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল তার দাঁতে। তখনোও জালের একটা দড়ি কাটা বাকি ছিল। ব্যাধকে আসতে দেখে হরিণ ভাবলো যে করেই হোক আমাকে পালাতে হবে। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে মারল এক লাফ। তাতে ফাঁদের দড়িটা ছিঁড়ে গেল। হরিণ প্রাণপণে লাগাল ছুট। কচ্ছপ যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে পড়েছিল। ব্যাধ কচ্ছপকে ওই অবস্থায় দেখে কোনোদিকে না তাকিয়ে থলিতে পুরে নিল। তারপর মনের আনন্দে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য হরিণ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন সে আর চলতে পারছে না। এতে ব্যাধ খুব খুশি হলো। কচ্ছপ-সহ থলিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হরিণের দিকে ছুটে চলল। ব্যাধ যতই এগিয়ে আসে, হরিণ ততই পেছনে সরতে থাকে। এইভাবে চলতে চলতে গভীর জঙ্গলে পৌঁছে গেল। জঙ্গলের মধ্যে ব্যাধ দিশেহারা হয়ে পড়লো। এদিকে হরিণ ছুটে এসে কচ্ছপকে মুক্ত করে দিল। কচ্ছপ টুপ করে জলে নেমে পড়লো। ব্যাধ ছুটতে ছুটতে থলির কাছে এসে মাথা চাপড়াতে লাগলো — কচ্ছপের তো কোনো চিহ্ন নেই, খালি পড়ে আছে থলিটা। মনের দুঃখে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ব্যাধ চলল বাড়ির দিকে।

তিনবন্ধু আবার মহাসুখে বাস করতে লাগল। *(সংগৃহীত)*

ভারতের বিপ্লবী

প্রফুল্ল চাকী

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম পূর্ববঙ্গের বগুড়ার বিহারগ্রামে। রংপুরে পড়াশোনার সময় বাড়িতেই কুস্তির আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বান্ধব সমিতিতে যোগ দিয়ে বিপ্লবীদলের কর্মী হন। রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ছাত্রদের লাঠিখেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিখিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সৈনিকী শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। ১৯০৬ ক্রিস্টাব্দে বারীন ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় আসেন এবং পূর্ববঙ্গের ছোটলাট বামফিল্ড ফুলারকে হত্যার জন্য নিয়োজিত হন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে মানিকতলার মুরারীপুকুরে আসেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশে তিনি ও ক্ষুদিরাম বসু মজফ্‌ফরপুর যান কিন্তু ভুলবশত তাঁদের ছোঁড়া বোমায় দুজন নিরাপরাধ মহিলা নিহত হন। ধরা পড়লে নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

জানো কী?

- মালদহ শব্দের অর্থ হলো সম্পদের সাগর।
- প্রাচীন বাঙ্গলার গৌড়রাজ্যের অংশ ছিল মালদহ।
- বিখ্যাত সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান মালদহের চাঁচলে।
- রেশম ও ফল প্রক্রিয়াকরণ হলো মালদহের প্রধান শিল্প।
- গৌড়ের রামকেলিতে বসে মালদহের বিখ্যাত মেলা।
- মালদহের প্রধান লোকনাট্য হলো গম্ভীরা।
- ইংলিশবাজারের পূর্বনাম হলো রংরেজবাজার।

ভালো কথা

পিঁপড়ে ও পাখিদের নিয়ম

চৈত্রমাস পড়তেই ঠাকুমা বাড়ির উঠানে তুলসীতলায় পিঁপড়ের জন্য এবং ছাদে পাখির জন্য একটি পাত্রে জল রাখা শুরু করেছেন। প্রতি বছর রাখেন। এবার আমি কদিন ধরেই লক্ষ্য করছি পিঁপড়ে ও পাখিদের সমাজে একটি নিয়ম আছে। সকাল থেকে দুপুর অবধি কখনো ছোটো ছোটো লাল পিঁপড়ে, কখনো কালো পিঁপড়ে, কখনো কাঠপিঁপড়ে, কখনো ডেয়ো পিঁপড়ে জল খেতে আসে। পখিরাও নিয়ম করে ওভাবেই আসে। সবারই আসার একটা সময় নির্দিষ্ট আছে। আমি ভেবে অবাক হই, মানুষ ঠিকভাবে নিয়ম পালন করে না কেন? মানুষ এত ঝগড়া, মারামারি করে কেন?

স্নেহাংশু মহান্তি, একাদশশ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মা

কবিতা নাথ, দ্বাদশ শ্রেণী, ঝিল বাগান কলকাতা-১৫৭

প্রথম যেদিন কেঁদে উঠেছিলাম মা বলে
মা-ই তো কোলে তুলে নিয়েছিল খুকি বলে,
প্রথম কথা শেখাও তো মায়ের সেই মুখের বোলে
আজও তো কথা বলি মায়ের শেখানো কথার জোরে।
মা, তুমি যে আমার কাছে অপরূপা
তুমিই তো মাগো আমার প্রথম প্রিয়তমা।
তোমায় মাগো ভালোবাসি আমি
তাই আজও আমার কাছে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ তুমি।
তুমিই তো মা যে শুধু আমার মা
তাই আজও ভালোবাসি মাগো তোমায়
মা-মেয়ের সম্পর্ক সে কী কোনোদিন ভোলা যায়।
ভালো আছি মা তুমিও ভালো থেকো
আমার ভালোবাসা নিও, সোনা মা
পারলে মাগো তোমার একটু ভালোবাসা দিও।
তোমার ভালোবাসাই আমার স্বর্গসুখের বাসা,
তোমার শেখানো ভাষাই আমার সব শেখার আশা।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

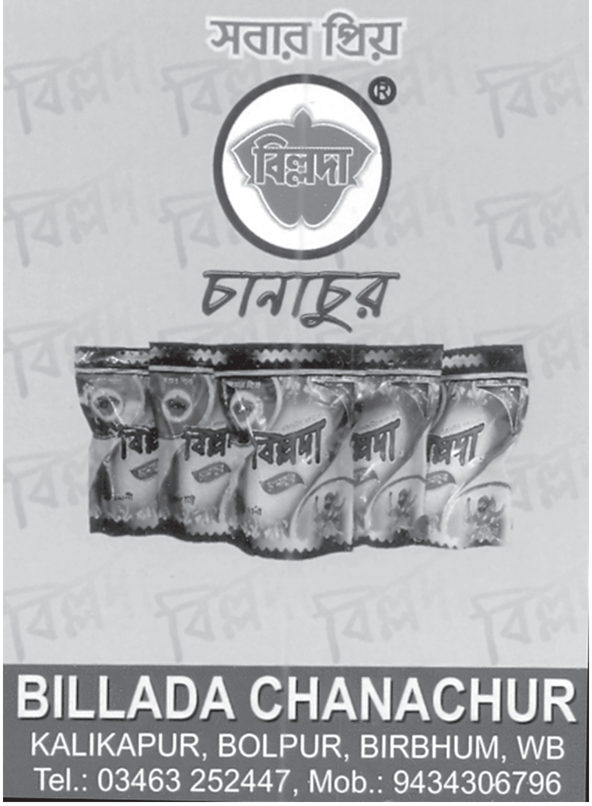

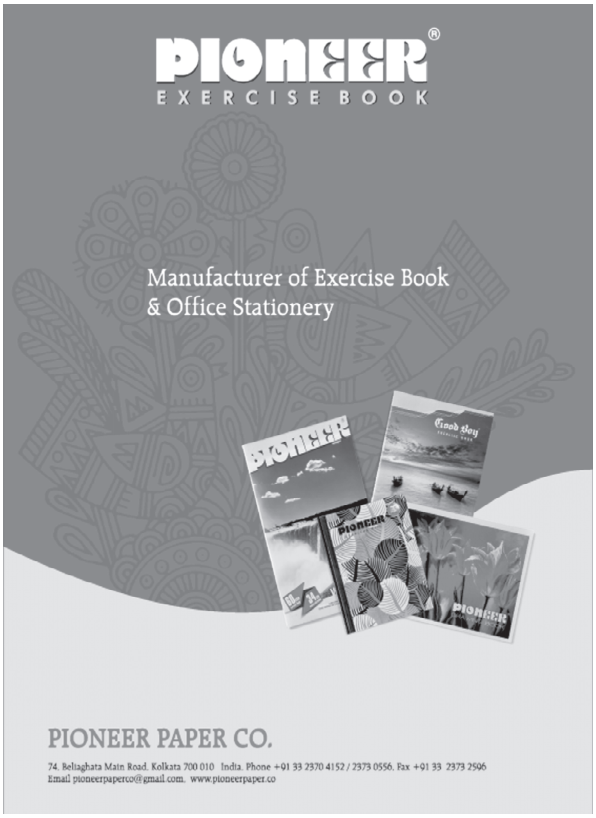

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কাশ্মীর ফাইলসের দর্শন দিয়ে কাশ্মীরকে ফিরে দেখা

৩৫এ ধারা এবং এর রাজনৈতিক ফলশ্রুতি

বিমল শংকর নন্দ

১১ মার্চ ২০২২-এ মুক্তিপ্রাপ্ত ১৭০ মিনিটের একটি সিনেমা। বাজেট ১৫ কোটি। ৯ দিন পর এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত বক্স অফিস আয় করেছে ১৫০ কোটি ছুঁই ছুঁই। চিরাচরিত সুপারহিট বিনোদনমূলক সিনেমা যা আয় করে, বাস্তবের ঘটনা অবলম্বনে বিবেক অগ্নিহোত্রীর ছবি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' তাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে এই সিনেমাটিকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা, তর্কবিতর্ক, যুক্তি, পালটা যুক্তির অবতারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে এর আগে তা কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই সিনেমা বহুদিন ধরে বহু প্রচেষ্টার মাধ্যমে লুকিয়ে রাখা কিছু সত্যকে সবার সামনে মেলে ধরেছে। অ্যাকাডেমিক আলোচনায় এগুলো স্থান পেত নিশ্চয়ই, কিন্তু জনগণের মনে চলচ্চিত্রের প্রভাব পড়ে অনেক বেশি। তাই তিন দশক আগে ঘটে যাওয়া নরহত্যা, নারীর সম্ভ্রমহানি, জীবন বাঁচাতে প্রায় এক লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতের উপত্যকা ছেড়ে পালিয়ে আসা এবং 'অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ' হয়ে নিজের দেশেই পরবাসী হয়ে যাওয়া ঘটনাগুলো গোটা দেশের মানুষের বিবেককে নাড়িয়ে দিচ্ছে। ছবিটিকে নিয়ে এত আলোচনা এ কারণেই।

তবে বর্তমান নিবন্ধের বিষয় কাশ্মীর ফাইলস ছবিটির কোনো রিভিউ নয়। কাশ্মীর ফাইলস ছবিটি অসহায় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীর ত্যাগের এক জ্বলন্ত দলিল। অসহায় মানুষগুলো তাদের প্রতিভূ সরকারের কোনো সাহায্য পায়নি। অথচ নাগরিককে নিরাপত্তা দান করা সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক দায়িত্ব। বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া কিছু সাংবিধানিক ধারা বলে বলীয়ান রাজ্য প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরেই তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারগুলিও এই সাংবিধানিক ধারার অজুহাত দেখিয়ে রাজ্যে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। এই গা-বাঁচানোর রাজনীতিতে কিছু দল ও নেতার রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে হয়তো। কিন্তু নিরীহ মানুষের একটি অংশের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা পায়নি। নিরপরাধ কাশ্মীরি

পণ্ডিতদের দুর্দশার একটি বড়ো কারণ হলো একটি সাংবিধানিক ধারাকে না বদল করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে প্রায় সাত দশক ধরে টিকিয়ে রাখা। এটি হলো সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা। এ প্রসঙ্গে ৩৫এ অনুচ্ছেদটিরও উল্লেখ করা যায়। ২০১৯ সালে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এই দুটি অনুচ্ছেদই বাতিল করে দেয়। এক ঐতিহাসিক বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় এই অনুচ্ছেদগুলি বাতিলের মাধ্যমে। এবার শুরু হয়েছে এক নতুন ইতিহাসের নির্মাণ পর্ব। দ্য কাশ্মীর ফাইলস ছবিটি সেই নতুন ইতিহাস নির্মাণের একটি অংশ।

৩৭০ ধারা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৭ অক্টোবর। এই ধারাবলে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতীয় সংবিধানের আওতামুক্ত রাখা হয় (অনুচ্ছেদ ১ ব্যতিরেকে) এবং ওই রাজ্যকে নিজস্ব সংবিধানের খসড়া তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়। এই ধারাবলে ওই রাজ্যে ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে যায়। ইতিহাসের এই অধ্যায়টিকে আর একটু আগে থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ভারতে দুই ধরনের কর্তৃত্বের উপস্থিতি ছিল। একটি ছিল 'ব্রিটিশ ভারত' যা ব্রিটিশরা সরাসরি শাসন করতো এবং অপরটি ছিল রাজন্যবর্গ শাসিত দেশীয় রাজ্য যা ভারতীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত ছিল। এই ভারতীয় রাজন্যবর্গ ব্রিটিশদের কাছে তাদের সার্বভৌমিকতা প্রদান করেছিলেন। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে তাঁরা ছিলেন ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে, আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মোটামুটি স্বাধীনভাবে তাঁরা প্রশাসন পরিচলনা করতেন। খুব প্রয়োজন না হলে ব্রিটিশরা তাদের প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতো না। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত থেকে বিদায় নেওয়ার পর ৫৬২টি রাজন্য শাসিত রাজ্য তাদের সার্বভৌমিকতা ফেরত পায়। তখন তাদের সামনে তিনটি সম্ভাবনা ছিল : প্রথমত, স্বাধীন দেশ হিসেবে

ফঃ ৬

অস্তিত্ব বজায় রাখা, দ্বিতীয়ত, ভারতে যোগদান করা অথবা তৃতীয়ত, পাকিস্তান যোগ দেওয়া। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিরলস প্রচেষ্টায় অধিকাংশ ভারতীয় রাজা ভারতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কয়েকজন রাজা সমস্যা সৃষ্টি করলেও সর্দার প্যাটেলের 'নরম-গরম' নীতি এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে পেরেছিল। এই দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই।

কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ প্রাথমিকভাবে স্থির করেছিলেন তিনি স্বাধীনভাবে থাকবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে স্থিতাবস্থা রক্ষার চুক্তি করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর ছদ্মবেশী পাক সেনা কাশ্মীর আক্রমণ করে। নিজের রাজ্যকে রক্ষা করতে অসমর্থ হরি সিংহ ভারতের সাহায্য চান এবং এই ঘটনাপ্রবাহ কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঘটায়। ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর হরি সিংহ ভারতভুক্তির চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং ২৭ অক্টোবর ১৯৪৭ গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন সেই চুক্তি অনুমোদন করেন। কিন্তু কাশ্মীরের ভারতভুক্তির শর্তে কাশ্মীরের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যার ফল ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ ধারা।

ভারতীয় সংবিধানের একবিংশ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ হলো ৩৭০। এই অংশের শিরোনাম হলো 'সামরিক, পরিবর্তন সাপেক্ষ এবং বিশেষ বিধান।' পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিষয়ক ৩৭০ ধারার গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। ১৯৫৪ সালের নির্দেশ মোতাবেক প্রায় গোটা ভারতীয় সংবিধানই সমস্ত সংশোধনী-সহ জম্মু ও কাশ্মীরে কার্যকরী হয়ে যায়।

৯৭টির মধ্যে ৯৪টি কেন্দ্রীয় তালিকা, সংবিধানের ৩৯৫টি ধারার মধ্যে ২৬০টি এবং ১০টির মধ্যে ৭টি তফশিলও সেখানে কার্যকরী হয়। ১৯৬৩ সালের ২৭ নভেম্বর জওহরলাল নেহরু নিজে লোকসভায় বলেছিলেন যে ৩৭০ ধারা যথেষ্টই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ৩৭০ ধারা থেকেই প্রবাহিত হয়েছিল ৩৫এ ধারা যা ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতির নির্দেশের মাধ্যমে কার্যকরী হয়। এই ধারাবলে জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা কাদের বলা হবে, তাদের বিশেষ অধিকারগুলি কী কী, এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়।

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা বিলুপ্তির মাধ্যমে সমগ্র ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের একীকরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫৪ সালেই যখন ৩৭০ ধারার গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল তাহালে এতদিন তা টিকিয়ে রাখা হলো কেন? এর উত্তর একটাই। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের স্বার্থে নয়, এই ধারাগুলি টিকিয়ে রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। কাশ্মীর উপত্যকার দু-একটি পরিবারভিত্তিক দলের প্রয়োজনে। আর সাড়ে পাঁচ দশকের বেশি সময় কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসও এই ধারাগুলির বিলোপ সাধন করে কাশ্মীরকে ভারতীয় সমাজের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করেনি। বরং স্থানীয় রাজনীতির প্রয়োজনে কাশ্মীরের পৃথক সত্তাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা।

স্বাধীনতার পর কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে দুটি পরস্পরবিরোধী মত ছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার প্রতিবাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘ প্রথম থেকেই এক দেশ দুই বিধানের বিরোধিতা করেছে। জনসঙ্ঘের উত্তরসূরি ভারতীয় জনতা পার্টিও নীতিগতভাবে ৩৭০ ধারা বিলোপকে তার প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচি বলে ঘোষণা করেছিল ১৯৮০ সাল থেকেই। অন্য মত ছিল মূলত বাম উদারবাদীদের। কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলো এই ভাবনাকেই অনুসরণ করে গেছে। এই মত অনুযায়ী যেহেতু বিশেষ মর্যাদার শর্তসাপেক্ষে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নে প্রবেশ করেছে তাই এই মর্যাদা খর্ব করা অসম্ভব। 'জনগণের মত নিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে'— এই কথাটির মাধ্যমে লুকিয়ে থাকে কোনও সিদ্ধান্তকে অনির্দিষ্টকাল ঝুলিয়ে রাখার অভিসন্ধি। কারণ জনগণের মত কখনোই নেওয়া হয় না। সমস্যাটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেলে রাখা হয়। কারণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলে রাজনৈতিক লাভ ওঠানোর সম্ভাবনা চলে যায়।

সুতরাং ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রের শাসকদল কংগ্রেসের সঙ্গে কাশ্মীরের আঞ্চলিক দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের এক অদ্ভুত ভালোবাসা ও ঘৃণার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর একান্ত সুহৃদ শেখ আবদুল্লাকে ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত জেলে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর অনেক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর ১৯৭৫ সালের ইন্দিরা-শেখ আবদুল্লা সমঝোতা অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হন শেখ আবদুল্লা। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ন্যাশনাল কনফারেন্স দলে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ফারুক আবদুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং গুলাম মহম্মদ শাহের সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়া হয়। এই সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। ১৯৯০ সালে আবার ফারুক আবদুল্লা সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। কেন্দ্রে তখন ভিপি সিংহের সরকার। এই ধরনের রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলেছে বহুদিন ধরে। কিন্তু এর আড়ালে ঘটে চলা একটি মারাত্মক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চলেছিল কাশ্মীরে, যা দেখেও কেন্দ্রীয় সরকার বহুদিন চোখ বুজে ছিল। ৩৭০-এর স্বাধিকারকে ঢাল করে প্রথমে শেখ আবদুল্লা, পরে ফারুক আবদুল্লার মদতে কাশ্মীরে সমাজ ও রাজনীতির ব্যাপক ইসলামীকরণ ঘটে। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো রাজ্যে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মদত পেতে থাকে, পাকিস্তানের মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো ভয়ংকর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এরই ফলে বিগত শতাব্দীর ৮০-এর দশকের শেষ থেকে ৯০-এর শুরুতে কাশ্মীরে ঘটে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির উত্থান, যার ফল কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হেনস্থা, হত্যা এবং কাশ্মীর ত্যাগের ট্র্যাজিক ঘটনা।

তাই যে প্রেক্ষাপটে কাশ্মীর থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের চলে আসতে হয়েছিল তাকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। সংকীর্ণ রাজনীতি, সাধারণ মানুষের একটি অংশের কষ্ট ও দুর্গতিকে গুরুত্ব না দেওয়াই কাশ্মীরের মানুষের দুর্দশা বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সময় প্রয়োজন ছিল ৩৭০ ধারা বিলোপ করার মতো সিদ্ধান্তের। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সেই সাহস দেখাতে পারেনি। ২০১৯-এ নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার সেই সাহস দেখিয়েছে। ফলে কাশ্মীর সমস্যাও এক স্থায়ী সমাধানের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। □

বাংলাদেশে হিন্দুদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন

বাংলাদেশে হিন্দু তথা সংখ্যালঘুদের বাঁচতে হলে লড়াই করেই বাঁচতে হবে। আর এটাই তাদের ভবিতব্য। লড়াই কিন্তু এককভাবে করলে চলবে না। সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে। তবেই আসতে পারে প্রত্যাশিত ফল।

ধীরেন দেবনাথ

ভারতে হিজাব-বিতর্কের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইসলামিক মোল্লা, মৌলবি, হেফাজতিরা শাঁখা, সিঁদুর পরা যাবে না বলে হিন্দুদের হুমকি দিয়েছে। তবে এ ঘটনা বাংলাদেশে এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেও বহুবার বহু হুমকি, ধমকি ও হুঁশিয়ারি শুনতে হয়েছে হিন্দুদের। অবশ্য সেসব ছিল পাড়া বা এলাকাভিত্তিক। কিন্তু এবার তা বাংলাদেশ জুড়ে।

পূর্ব পাকিস্তানেও দেখেছি বহু হিন্দুকে ধুতি পরতে। প্রায় সব হিন্দু পুরুষই ধুতি পরতেন। মহিলারাও পরতেন শাঁখা-সিঁদুর। কোনো বাধা- নিষেধ ছিল না। ইসলামিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও সরকার তো নয়ই, মোল্লা, মৌলবি, ইমাম, পির, ধর্মগুরুরা— এমনকী সরকারি দল মুসলিম লিগের নেতা-কর্মী-সমর্থকরাও এহেন নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি বা হুমকি দেননি হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পালনে। বরং সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পালনে কেউ বাধা দিলে তার আইনত শাস্তিও হতো। যাটের দশকে পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম লিগ সরকারের এক মন্ত্রী ভবানীশঙ্কর বিশ্বাস ধুতি পরতেন।

১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের সহায়তায় স্বাধীনতাপ্রেমী মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে সৃষ্টি হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। লুপ্ত হয় পূর্বপাকিস্তান। পাক কারগার থেকে মুক্তি পান বাংলাদেশের 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় তিনি যুদ্ধাপরাধী রাজাকর, আলবদর, আলশামস্, জামাত, জেহাদি, খুনি, লুটেরা, ধর্ষক, পাকিস্তানপন্থী এক শ্রেণীর সেনা ও সেনা-অফিসার এবং পাক-সমর্থকদের আবেগতাড়িত হয়ে 'আমরা সবাই বাঙ্গালি, ভাই' বলে ক্ষমা করেছেন। আর এটাই হয়েছে ভুল, এটাই হয়েছে কাল বা ধ্বংসের কারণ। অকৃতজ্ঞ পাকপন্থী যুদ্ধাপরাধীরা তাই ক্ষমার সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শেখ মুজিবের বিশ্বস্ত বন্ধু, সরকারি দল আওয়ামি লিগ নেতা, মন্ত্রী ও আমেরিকানপন্থী এবং সর্বোপরি ক্ষমতালোভী খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ ভারত-বন্ধু মুজিবকে হত্যা করে। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে ইসলামিক দেশে পরিণত করা এবং সরকারি ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পাকপন্থী তথা মুজিব বিরোধী কিছু উচ্চপদস্থ সেনা ও গোয়েন্দা অফিসার, নেতা-মন্ত্রী এবং আমেরিকা, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। তিনি মুজিব হত্যা ষড়যন্ত্রের পাণ্ডা বা মূল ষড়যন্ত্রী। তারপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক নৃশংস সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হন শেখ মুজিবুর রহমান। দুই বিবাহিতা কন্যা হাসিনা ও রেহানা বিদেশে থাকায় রক্ষা পান। কিন্তু শেখ মুজিবের বহু নিকটাত্মীয়, বন্ধু ও আওয়ামি লিগ নেতাকে হত্যা করা হয়।

এমনকী, চার জাতীয় নেতা ও মুজিব মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তজউদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও কামরুজ্জমানকে (যাঁরা মুজিবনগরে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে। পাক কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন রাষ্ট্রপতি ও নজরুল ইসলাম ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি) কারারুদ্ধ অবস্থায় বিনা বিচারে হত্যা করা হয়। মোস্তাক নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি রূপে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ হয় ইসলামিক দেশ। মেজর জিয়াউর রহমানকে সেনাধ্যক্ষ করা হয়। তারপর বাংলাদেশে ঘটে আরও দুটি সামরিক অভ্যুত্থান। মোস্তাককে সরিয়ে রাষ্ট্রপতি হন জিয়া। আবার জেনারেল জিয়াকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল এরশাদ। এরশাদই সংবিধানে ঢোকান—'বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' কথাটি।

তারপর বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরে এলে ক্ষমতায় আসেন জিয়া-পত্নী ও দলীয় (বিএনপি) নেত্রী খালেদা জিয়া। বর্তমানে বাংলাদেশ শাসন করছেন মুজির-কন্যা শেখ হাসিনা। কিন্তু হাসিনা সরকার সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ফিরিয়ে আনেনি। সংবিধান থেকে 'বাংলাদেশের রাষ্টধর্ম ইসলাম' কথাটি বাদ দেওয়া হয়নি। বরং বলা ভালো, সাহস দেখায়নি। কারণ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। ইসলামপন্থী। ইসলামিক দেশের সমর্থক। আর ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সংখ্যালঘু। তার মধ্যে মাত্র ১০-১২ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। কাজেই ভোটে জিতে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে ইসলামপন্থীদের ভোট যে প্রয়োজন তা হাসিনার দল এবং হাসিনা বিলক্ষণ জানতেন। তাই ক্ষমতার স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকার ও দল নিয়েছেন মোল্লাবাদীদের তুষ্টিকরণের পথ। তাই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ এখন এক ইতিহাস। অবশ্য শেখ মুজিবুরও একদা ছিলেন মুসলিম লিগ নেতা সুরাবর্দির শিষ্য।

তাই পঞ্চাশ বছর আগে অবিবেচক ও অদূরদর্শী রাজনৈতিক শেখ মুজিবুর রহমান ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে যুদ্ধপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা করে ভুলের যে বিষবৃক্ষটি বাংলাদেশের মাটিতে বপন করেছিলেন, সেটি এতদিনে ডালপালা ছড়িয়ে এক মহীরুহ। সেদিনের মানবতার শত্রু রাজাকার, আলবদর, জঙ্গি, জামাত, জেহাদি ও তাদের বংশধরেরা ইসলামিক বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আর তা সফল করতে হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। হিন্দুদের মেয়ে, বউ, জমি, সম্পত্তি ভয় দেখিয়ে বা জোরজবরদস্তি কেড়ে নিচ্ছে। হিন্দুরা বিচার পাচ্ছে না। একইভাবে তারা হিন্দুদের দেশছাড়াও করেছে।

বাংলাদেশে হিন্দুরা নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান ছাড়া ধুতি পরে না বললেই চলে। তাও সবাই নয়। অধিকাংশ হিন্দু লুঙ্গি পরেন। বাকিরা পরেন প্যান্ট-শার্ট বা পঞ্জাবি, পাজামা। তবে বিবাহিতা হিন্দু মহিলারা এখনও শাঁখা-সিঁদুর পরেন। এতে কোনো সরকারি বিধিনিষেধও নেই। তাই এই রীতিনীতি চলে আসছে সেই পাকিস্তান আমল থেকে। এসব ছিল হিন্দুধর্মীয় ও সামাজিক অধিকারের অঙ্গ। এবার সেই অধিকারে কোপ পড়েছে মোল্লাবাদীদের ফতোয়ায়। তবে বাংলাদেশি হিন্দুরাও আশ্চর্যজনক ভাবেই এবার গর্জে উঠেছে ওই ফতোয়ার বিরুদ্ধে। শতশত হিন্দু রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দুছাত্র ও যুব মহাজোটের নেতৃত্বে হিন্দুরা ২৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বা জুম্মাবার ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ব্যানার, ফেস্টুন হাতে নিয়ে ঢাকা শহর জুড়ে মহামিছিল করেছে। ব্যানারে লেখা ছিল— ‘মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশ্যে বাংলাদেশের হিন্দুনারীদের শাঁখা, সিঁদুর ও হিন্দু পুরুষদের ধুতি পরা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকির প্রতিবাদেই এই ধুতি মিছিল।’

একদা পূর্ববঙ্গ, পূর্বপাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু নির্যাতন, হত্যা, নারী ধর্ষণ ও অপহরণ, হিন্দু বাড়ি লুণ্ঠন, জমি দখল ও দেশছাড়া করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সংখ্যালঘু নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান উপরের দিকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকার, আলবদর ও জামাত-জেহাদিদের হাতে খুন হয়েছে কয়েক লক্ষ হিন্দু, হাজার হাজার হিন্দু নারী ধর্ষিতা, অপহৃতা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে সেই অসভ্যতা আজও অব্যাহত। কয়েক বছর আগে চট্টগ্রামের (কক্সবাজার) সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রামু বৌদ্ধমন্দিরে দাঙ্গাবাজ জামাত-জেহাদিদের সশস্ত্র হামলা, ভাঙচুর, লুণ্ঠন ও সন্ন্যাসীদের মারধর করা হয়। গত দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর ভোরে কুমিল্লার নানুয়াদিঘির একটি পুজোমণ্ডপে হনুমান মূর্তির পায়ের কাছে কোরান রাখাকে কেন্দ্র করে শুধু কুমিল্লায় নয়, সারা বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও অত্যাচার। সুপরিকল্পিত সেই আক্রমণে ইন্ধন জুগিয়েছিল রাজাকরার, জামাত, জঙ্গি, জেহাদিরা। লুণ্ঠিত হয়েছিল হিন্দুদের অসংখ্য ঘরবাড়ি। গৃহদাহ, নারী ধর্ষণ, অপহরণ ও হত্যার ঘটনও ঘটেছিল। সরকার ‘ধীরে চলো’ নীতি নিয়েছিল। কারণ সেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে আত্মসমর্পণ করেছে মোল্লাবাদীদের কাছে। আসলে ক্ষমতা যে বড়ো বালাই। আর এটা বুঝেও গেছে মৌলবাদীরা। তাই তারা হিন্দু নির্যাতন, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংসে উৎসাহিত হচ্ছে। আর এতে সরকারি দলের প্রচ্ছন্ন মদত থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ সরকারি দলেও বহু মোল্লাবাদী রয়েছে। বিশ্বমানবাধিকার কমিশনও বাংলাদেশের ওপর সন্তুষ্ট নয়। বরং ক্ষুব্ধ-বিরক্ত। সতর্ক করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার তাতে কর্ণপাত করছে না। আর এতেই উল্লসিত মানবতার শত্রু, হিন্দু-বিদ্বেষী ইসলামিক মোল্লাবাদীরা। সারা বাংলাদেশে এরা ছড়িয়ে দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতর বিষবাষ্প।

আর এহেন অস্তিত্ব বিপন্নের প্রতিকূল আবহে অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ও তাগিদে সারা বিশ্বে বার্তা পাঠাতে হিন্দুরা ধুতি পরে মোল্লাবাদীদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে সব হুমকি-হুঁশিয়ারিকে উপেক্ষা করে, রাজধানী ঢাকার রাস্তায় জোরদার প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়েছে। মানবতা বিরোধী দানবদের হাত থেকে বাঁচতে এটা তাদের অত্যন্ত সাহসী ও বাস্তবোচিত পদক্ষেপ। মুখ বুজে সব সহ্য করা আত্মহত্যার শামিল। তাই এতদিনে বাংলাদেশের হিন্দুরা বুঝেছে, বাঁচতে হলে প্রতিবাদ করেই বাঁচতে হবে। কারণ তাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। বিশ্বের হিন্দু সমাজ ও মানবতাবাদীরা তাদের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রশংসাও করেছেন। ভারতও আছে তাদের পাশে। বিশ্বের হিন্দু সংগঠনগুলিও বাংলাদেশের মুসলমান মোল্লাবাদীদের হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বিরোধী ফতোয়া ও হুঁশিয়ারির নিন্দা করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এখন দেখা যাক, কোথার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ সরকারই-বা কী পদক্ষেপ নেয়। তবে একথাও সত্যি, বাংলাদেশে হিন্দু তথা সংখ্যালঘুদের বাঁচতে হলে লড়াই করেই বাঁচতে হবে। আর এটাই তাদের ভবিতব্য। লড়াই কিন্তু এককভাবে করলে চলবে না। সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে। তবেই আসতে পারে প্রত্যাশিত ফল।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

With Best compliments from -

A Well Wisher

এই আগুন বাঁচিয়ে রাখুন, প্রিয় নাট্যকার

মনোজিৎ সরকার

একটি অরাজনৈতিক মানবিক আবেদন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে একমাত্র সংখ্যালঘু দরদি, হিন্দুবান্ধব, আসল গরিবের বন্ধু চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সর্দার করিম ভাইকে ঘোড়া চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন। পরনে চেক লুঙ্গি, পায়ে মহার্ঘ্য জুতো, চোখে কালো সানগ্লাস। সভায় ঢুকছেন করিমভাই। ঘরোয়া রাজনৈতিক সভা। উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান (পুরুষ-নারী) মিলিয়ে জনাকুড়ি। দুটি বিশেষ চেয়ার। একটিতে অসহায় প্রাচীন এক মুক্তিযোদ্ধা। অন্যটিতে অবশ্যই করিম ভাই। এভাবেই এক মিনি বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গন প্রেক্ষগৃহে।

কালো চশমা ঢাকা করিম ভাইয়ের আদব খল হলেও তিনি খাঁটি হিন্দুপ্রেমী। অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্ন উস্কে দিয়েছেন দর্শকমনে। যেমন ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) ৩৪ শতাংশ হিন্দু ছিল, বর্তমানে তা ৭ শতাংশ, গেল কোথায় এই সংখ্যালঘু হিন্দুরা? হুসেন মহম্মদ এরশাদের রাজত্বকলে সেই সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলামে রূপান্তরিত করেছিলেন। নানাভাবে হিন্দু নিধন, ধর্ম (কোরান) অবমাননার, কোরান অপবিত্র করার গুজব রটিয়ে হিন্দু মন্দির, মূর্তি ধ্বংস, যখন তখন অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হিন্দুদের কলকাতা তথা ভারতে শরণার্থী হওয়ার চলমান স্রোত আজও বহমান। করিম ভাই চায় তাই বেঁচে থাকা সাত শতাংশ হিন্দুদের জন্য 'হিন্দু সুরক্ষা আইন'। একটাও হিন্দু যেন ভারতে না আসে। চায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব মন্ত্রণালয় (দফতর) যা অসহায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কোতল নয়, সুরক্ষা দেবে।

অসাম্প্রদায়িক দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের দাবি নিয়ে করিমভাই ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা, খুলনা, ঢাকার শাহবাগের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন। যশোরেশ্বরী মন্দির কেমন করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গেল, যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুজো দিয়েছিলেন। করিমভাইয়ের নাটক দুর্দান্তভাবে অনেক তথ্য ও নিরন্তর ইতিহাস সঞ্জাত সমসাময়িক বাংলাদেশের আক্রান্ত হিন্দুদের সচল দলিল। অসহায় হিন্দু মুক্তিযোদ্ধারা। প্রবীর মণ্ডল এই নাটকের নাট্যকার, অভিনেতাদের কুর্নিশ। তাঁর অগের নাটক 'হিন্দু চোর'-এর সেই সংলাপ 'আমাগো হিন্দুগো দ্যাশ কোনটা?' এই মৌলিক প্রশ্ন দুই বঙ্গ সমেত গোটা উপমহাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

সাহস! সাহস! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাঙা চোখকে অগ্রাহ্য করে প্রবীর মণ্ডল 'হিন্দু চোর গিরেন'কে তৈরি করতে পেরেছিলেন। একক অভিনয়। সাতক্ষীরা যেন আস্ত আমাদের হৃদয়। ৩০ জুলাই ২০১৮সালে আই সি সি আর প্রেক্ষাগৃহে প্রবীর নিজের জাত চিনিয়েছেন এই নাটকে। একটা শো-তেই তোলপাড় প্রশাসন। আর বর্তমানে এই নাটক 'করিম ভাই' নিঃসন্দেহে বর্তমান বাংলাদেশি অসহায় হিন্দুদের অক্সিজেন জোগাবেই।

মুক্তাঙ্গনের প্রথম শো-তে সংগীত আয়োজন ভালো আলোর প্রক্ষেপণ মন্দ নয়, তবে গ্রুপ থিয়েটারের মূল দ্যোতনা হলো রিহার্সাল। প্রবীরের নিজের অভিনয়ের আলোয় অনেকটাই সেটা ঢাকা পড়লেও বাকি কুশীলবদের চাই নিগূঢ় প্রশিক্ষণ। তাহলে এই নাটক সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। অতিমারী-উত্তর আবহে এই নাটক নাট্যপ্রেমীদের কাছে উত্তম উপহার। পরের শোয়ের জন্য শুভেচ্ছা যদি শো-চলতে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালিদের সহমর্মিতা জরুরি। প্রবীর, বাঁচিয়ে রাখুন এই আগুনকে। □

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে ওয়ারীতে মন্দির আক্রমণ

শিতাংশু গুহ॥ হোলি বা দোল রঙের উৎসব। কবি গেয়েছেন, 'রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাও— যাওগো এবার যাবার আগে—'। ঢাকায় হোলি ছিল ১৮ মার্চ ২০২২। আগের দিন ১৭ মার্চ ওয়ারী ইস্কন মন্দিরে তৌহিদী জনতার আক্রমণে হিন্দুরা আহত হয়। তাই সেখানে দোল পূর্ণিমা উৎসবে কিছুটা ভাটা ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, 'রক্তাক্ত হোলি'। যেমনটা গত বছর দুর্গাপূজায় বলা হয়েছিল, 'রক্তাক্ত শারদ'।

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। তৌহিদী জনতা ওয়ারী মন্দির আক্রমণে এদিনটি কেন বেছে নিল কে জানে? গত বছর ১৭ মার্চ (২০২১) সুনামগঞ্জের শাল্লায় তৌহিদী জনতা হিন্দু পল্লীতে ভয়াবহ আক্রমণ করেছিল। ১৮ মার্চ, শবেবরাত, সৌভাগ্য রজনী। তৌহিদী জনতার ভাগ্য ফেরাতে কি এই আক্রমণ? হিন্দু নির্যাতন বাংলাদেশে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হলেও এক বছরে ৩টি বড়ো হামলা কী বার্তা দিচ্ছে?

প্রশাসন কী বলছে? ঢাকা থেকে জানলাম, ওয়ারীর ঘটনায় স্থানীয় থানা মামলা নিতে চায়নি তাই ওপরে ধরনা দিতে হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ফোন এলেই কেবল মামলা নেওয়া হয়। কলকাতার আরামবাগ টিভি ভাংচুরের কিছুটা দৃশ্য দেখিয়ে একজন ইস্কন প্রভুর বক্তব্য প্রকাশ করেছে। প্রভুর কথায় স্পষ্ট যে, পুলিশের সামনেই এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ বলেছে, তারা কথা শুনছে না।

সরকারি মহলের বক্তব্য, এটি জমি নিয়ে বিবাদের ফল। তারা বুঝতে চান না যে, বিবাদ মেটানোর জন্যে আদালত, সালিশ আছে। দু'শো লোক নিয়ে আক্রমণ 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড'— এটি রোধ করা সরকারের দায়িত্ব। মন্দিরের সম্পত্তি 'দেবোত্তর', কেউ চোরা পথে তা বিক্রি বা কিনে নিলে মালিকানা হয় না। বাংলাদেশে জোরপূর্বক মন্দিরের সম্পত্তি দখলের অসংখ্য ঘটনা আছে।

ওয়ারীতে ইস্কন মন্দিরটি রাষ্ট্রপতি ভবন বা 'বঙ্গভবন' থেকে বেশি দূরে নয়। এ ঘটনা দেশীয় মিডিয়ায় তেমন প্রচারিত না হওয়ায় কিছুটা ক্ষোভ আছে। মনে হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে মিডিয়া জগৎ বন্ধ ছিল। তবে ভারতীয় মিডিয়ায় এটি এসেছে। প্রথম কলকাতা নামক একটি দৈনিক হেডিং করেছে— 'আবার ঢাকার ইস্কন মন্দিরে হামলা! ভেঙে ফেলা হলো প্রাচীর, আহত বহু ভক্ত'।

হিন্দুস্থান টাইমস লিখেছে, ঢাকায় ইস্কন মন্দির তছনছ। ওপিইন্ডিয়া এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট করেছে, ইসলামি জনতা বাংলাদেশে মন্দির ধ্বংস, মূর্তি ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের উদ্ধৃতি দিয়ে এতে বলা হয়েছে, ৬২ বছরের হাজী শফিউল্লাহ এতে নেতৃত্ব দেন। তাঁরা আল্লাহ-হু-আকবর' স্লোগান দেয়।

এএনআই ১৮ মার্চ টুইট বার্তায় জানায়, ১৭ মার্চ রাতে ১৫০-২০০ জন মানুষ মন্দিরে হামলা চালায়। বিবিসি বাংলা নিউজটি টুইট করেছে। জি-নিউজ ইন্ডিয়া টিভি ভিডিয়ো দেখিয়ে বলেছে, দু'শো মানুষ ইস্কনের মন্দির আক্রমণ করেছে। নিউজ ১৮ বলেছে, একশো'র বেশি মানুষ আক্রমণ করেছে, ৩ জন আহত। ইন্ডিয়া টুডে জানায়, আহত ৩ জন হলেন, সুমন্ত চন্দ্র শ্রাবণ, নিহার হালদার ও রাজীব ভদ্র। ইন্ডিয়া টুডে হেডিং করেছে, 'হিন্দুদের কান্নায় জাতিসঙ্ঘ চুপ, হোলির দিন ঢাকায় মন্দির আক্রমণে কলকাতা ইস্কনের নিন্দা'। পত্রিকাটি বলেছে, প্রায় দু'শো মানুষ ওয়ারীর ইস্কন রাধাকান্ত মন্দির আক্রমণ করে। পত্রিকাটি জাতিসঙ্ঘ চুপ থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। গত বছর দুর্গাপূজার সময় হিন্দুদের ওপর আক্রমণে তিন জন নিহত হবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়।

শোকসংবাদ

মেদিনীপুর জেলার নিবড়া শাখার স্বয়ংসেবক বৃন্দাবন জানা দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৯ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি তাঁর বাবা-মা, সহধর্মিণী ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হলদিয়া নগর সেবাপ্রমুখ অমিয় কুমার জানার মাতৃদেবী গত ২৬ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মানব সভ্যতা ধ্বংসের তথ্য ধরে রাখবে ব্ল্যাক বক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা এখন থেকেই টের পাচ্ছে মানুষ। ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় থেকে শুরু করে বন্যা, খরা, ভূমিকম্প বা সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে আগের তুলনায়। বিজ্ঞানীদের তরফে বারবার বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সতর্কতা জারি হলেও কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ আজও চোখে পড়ছে না। পরিস্থিতির দ্রুত কোনো ইতিবাচক ও নাটকীয় পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে এভাবেই সভ্যতার বিনাশ হবে বলে অশনি সংকেত দিয়েছে সারা দুনিয়ায় বিজ্ঞানীরা। তবে এই যে একটু একটু করে শেষের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সঞ্চয় করে রাখা হোক— এমনটাই চান পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীরা। যা থেকে সুদূর ভবিষ্যতে নতুন কোনও সভ্যতার মানুষ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গোড়া থেকেই সাবধান হবেন। এই ভাবনা থেকেই একদল গবেষক, বিজ্ঞানী নেমে পড়েছেন পৃথিবীর ব্ল্যাক বক্স তৈরির উদ্দেশ্যে। ব্ল্যাক বক্স থাকে মূলত বিমানে। উড়ানের কোনো সময় বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়লে, তার ব্ল্যাকবক্স থেকে দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়। পৃথিবীর ব্ল্যাকবক্সও ঠিক সেই লক্ষ্যেই তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমান মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবীতে পরবর্তী কোনো সভ্যতা গড়ে উঠবে। সেই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রাণীরা যদি মানুষের মতো উন্নততর হয়, তবে বুদ্ধি বলে আবিষ্কার করে নিতে পারবে পৃথিবীর ব্ল্যাকবক্স। তারপর তার তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পারবে মানব সভ্যতার বিনাশের কারণ। জানতে পারবে পূর্বপুরুষদের সভ্যতা সম্পর্কে। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর ব্ল্যাকবক্স তৈরির এই বিশাল কর্মকাণ্ডটি সম্পন্ন হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়াতে। ইউনিভার্সিটি অব তাসমানিয়া এবং আরও দুটি বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ব্ল্যাকবক্স বসানো হচ্ছে তাসমানিয়ার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন জানিয়েছে, এই আর্থ ব্ল্যাকবক্স হবে একটি বিশাল বাক্স। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই বাক্সটির কোনো ক্ষয় ক্ষতি হবে না। বাক্সটিতে ইস্পাত ও গ্রানাইটের অনেকগুলো স্তর থাকবে। যার ভিতরে ইন্টারনেট সংযোগযুক্ত একটি স্টোরেজ ড্রাইভ লাগানো হবে। থাকবে নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি।

পুরো ব্যবস্থাটাই চলবে সৌরশক্তিতে। ব্ল্যাকবক্স চালু হওয়ার পর থেকে জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবর্তনের খুঁটিনাটি রেকর্ড হতে থাকবে তার ডেটা স্টোরেজে।

বঙ্গের জঙ্গি হটস্পট বাছাই উদ্যোগ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন সময়ে নানান নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছে। দেশ-বিরোধী কাজের অভিযোগে ইউএপিএ ধারায় গ্রেপ্তারের ঘটনাও রয়েছে অজস্র। সেইসব ঘটনাকে সামনে রেখেই জঙ্গি দমনে একটি রুটম্যাপ তৈরি করছে কেন্দ্র সরকার। সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে বাঙ্গলার কোথায় কোথায় জঙ্গি গতিবিধি রয়েছে, কিংবা অতীতে কোন কোন এলাকায় জঙ্গিরা বিশেষ সক্রিয় ছিল, রাজ্যের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তার তালিকা চেয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। ওইসব এলাকাকে জঙ্গি হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় সংস্থাসূত্রে খবর, শুধু এ রাজ্য নয়, অন্যান্য রাজ্যের কাছেও জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে এই ধরনের তালিকা চাওয়া হয়েছে। ভবানী ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, যে তালিকা তৈরি হচ্ছে তাতে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, উত্তর দিনাজপুর ও বর্ধমানের কিছু জায়গার উল্লেখ থাকতে পারে। এইসব এলাকা থেকে গত কয়েক বছরে এমন অনেক জঙ্গি ধরা পড়েছে, যাদের বিরুদ্ধে ইউপিএ ধারায় মামলা চলেছে।

২০১২ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সক্রিয় যোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। ২০২০ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে এনআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয় ৬ জন আলকায়দা জঙ্গি। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে সন্ত্রাসবাদী তানিয়া পারভিনকে গ্রেপ্তার করেছিল রাজ্য পুলিশ। এক পুলিশ কর্তার বক্তব্য, যেসব অকুস্থলে অতীতে জঙ্গি ধরা পড়েছিল বা তদন্তে যে যে জায়গায় জঙ্গি কর্মকাণ্ডের প্রমাণ মিলেছে, সেগুলিকে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করলে আগামীদিনে সেখানে সব তদন্তকারী সংস্থার পক্ষেই নজরদারি চালাতে সুবিধা হবে।

রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী দমনে দপ্তরের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সম্প্রতি কেন্দ্র গোয়েন্দা দপ্তরের বৈঠক হয়। সেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধি ছাড়াও এসআইবি, কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো-সহ জঙ্গি দমনে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই রাজ্য আধিকারিকদের ওই তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়।

SURYA FOUNDATION

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063, Tel. : 011-25251588, 25253681
Email : suryainterview@gmail.com Website : www.suryafoundation.org

सूर्या फाउण्डेशन युवाओं के समग्र विकास तथा प्रशिक्षण के लिए अब एक जानी-मानी संस्था बन चुकी है। इसका प्रमुख उद्देश्य है देश के प्रति निष्ठा रखते हुए अनेक तरह के उत्तरदायित्व निभाने के लिए तेजस्वी, लगनशील तथा धुन के पक्के नवयुवकों का निर्माण करना।
इन्टरव्यू में चयन हो जाने के बाद सूर्या साधना स्थली कैंपस में छ: माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद एक साल के लिए On Job Training (OJT) रहेगी।
संघ के संस्कारों में पले-बढ़े, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, शारीरिक रूप से सक्षम युवकों के सूर्या फाउण्डेशन में प्रवेश हेतु निम्न categories में इंटरव्यू

Post	Experience	6 months Initial Training + 1 year OJT	After Training CTC
CA	IPCC / MTER (2 Yrs Experience)	3 - 4 L Per Annum	As per Performance
	Fresher	5 - 6 L Per Annum	- do -
	Experienced (upto 5 years)	6 - 8 L Per Annum	- do -
	Experienced (above 5 years)	9 - 12 L Per Annum	-do -
Engineers, Fresher & Experienced	B.Tech (IIT)	7.5 - 9 L Per Annum	- do -
	B.Tech (NIT)	4.5 - 6 L Per Annum	- do -
	B.Tech (Other Institutes)	3 - 3.6 L Per Annum	- do -
	M.Tech (IIT)	8.5 - 10 L Per Annum	- do -
	M.Tech (NIT)	5.5 - 7 L Per Annum	- do -
	M.Tech (Other Institutes)	3.6 - 4 L Per Annum	- do -
MBA	MBA (IIT + IIM)	15 L + Per Annum	- do -
	MBA (IIM)	12 - 15 L Per Annum	- do -
	MBA (Other Institutes)	3 - 3.6 L Per Annum	- do -
Post Graduate & Graduate	MCA, B.Ed., M.Ed., MSW, M.Sc., M.Com., M.A. *(Freshers / Experience) Ph.D. **	2 - 3 L Per Annum	- do -
	Mass Communication (Media)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	B.Com. with three years experience in accounts, purchase, store	2.4 L Per Annum	- do -
	B.Sc. BCA, BBA, BA, B.Com (Persuing / Passed)	1.2 L Per Annum	- do -
	Diploma	1.8 L Per Annum	- do -
Law	LLB	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	LLM	3 - 3.6 L Per Annum	- do -

- उपरोक्त Categories में अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को इससे भी अधिक वेतन दे सकते हैं।
*** Ph.D. candidates भी आवेदन कर सकते हैं। salary interview के दौरान तय होगी।**
*** योग शिक्षक, प्राकृतिक चिकित्सक / उपचारक, Karate Teacher, Music Teacher & Stenographer (Hindi + English) भी आवेदन कर सकते हैं। वेतन योग्यता अनुसार दिया जाएगा।**

• Graduate Management Trainee (GMT)

योग्यता–2022 में 10वीं, 11वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 60% तथा गणित में 75% अंक प्राप्त किए हों। आयु : 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद On Job Training (OJT) or Practical Campus Training (PCT) में भेजा जायेगा। OJT / PCT के साथ-साथ ग्रेजुएशन और MBA या MCA करने की सुविधा दी जायेगी। प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा मुफ्त रहेगी, साथ ही 5,000/- प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलेगा। On Job Training के दौरान आवास तथा पढ़ाई के साथ-साथ 11वीं में 8000/-, 12वीं में 10,000/- Graduation Ist year में 12,000/-, IInd Year में 15,000/-, IIIrd Year में 18,000/-, MBA/MCA Ist Year में 22,000/-, MBA/MCA IInd Year में 27,000/- Stipend प्रतिमाह मिलेगा। MBA/MCA पूरा होने के बाद 40000/- और Work Performance के आधार पर प्रतिमाह वेतन / मानधन इससे अधिक भी हो सकता है।

• Assistant Staff Cadre (ASC)

योग्यता–2022 में 10वीं, 11वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 55% एवं गणित में 60% अंक प्राप्त किए हों। आयु : 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद OJT / PCT में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 3000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा तथा मुफ्त भोजन और रहने की व्यवस्था होगी। तीन वर्ष की OJT / PCT के दौरान Stipend - Ist year : 8,000/- प्रतिमाह व आवास, IInd year : 10,000/- प्रतिमाह व आवास, IIIrd year : 12,000/- प्रतिमाह व आवास। After training 15,000/- (CTC) प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

• Under Graduate Management Trainee (UGMT)

योग्यता–2020 में 12वीं कर चुके भैया आवेदन कर सकते हैं। 12वीं में न्यूनतम अंक 70% प्राप्त किए हों और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आयु : 19 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद On Job Training (OJT) or Practical Campus Training (PCT) में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा मुफ्त रहेगी। OJT / PCT के साथ-साथ Graduation के बाद MBA/PG in Mass Communication करने की सुविधा दी जायेगी। इस दौरान आवास तथा पढ़ाई के अलावा Graduation IInd year में 12,000/-, IIIrd Year में 14,000/- तथा Post Graduation Ist Year में 17,000/- तथा IInd Year में 20,000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा। Post Graduation पूरा करने के बाद 30,000/- (CTC) प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में ही भरकर भेजें। विस्तृत बॉयोडाटा के साथ-साथ यदि आपने NCC / NSS / OTC / ITC / शीत शिविर / PDC आदि कोई शिविर किया है तो उल्लेख करें। सेवा भारती / विद्या भारती / वनवासी कल्याण आश्रम के किसी विद्यालय / छात्रावास या संघ या परिषद अथवा विविध क्षेत्रों से संबंध रहा है तो कब और कैसे। सूर्या परिवार में कोई परिचित हों तो उनका नाम, विभाग भी जरूर लिखें। पढ़ाई का विवरण लिखते हुए, Mark sheet की फोटोकॉपी साथ जोड़ें।
कृपया विस्तारपूर्वक बायोडाटा के साथ निम्नलिखित पते पर अपना CV / आवेदन भेजें। CV / आवेदन Email से भी भेज सकते हैं।

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063 | Email : suryainterview@gmail.com

आवेदन की अंतिम तिथि : 30 अप्रैल, 2022